ফরিয়াদ

শ্রীমান সন্তোষকুমার ঘোষ

পরম কল্যাণীয়েষু

এক

হঠাৎ যেন বর্ষারাত্রির রিমিঝিমি বর্ষণসিক্ত অন্ধকারকে পটভূমিকে রেখে প্রেতিনী এসে সামনে দাঁড়াল। একেবারে সামনাসামনি। দরজার ওপাশে বারান্দার উপর সে আর এপাশে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে সুধাংশুবাবু।

১৯৬০ সাল জুলাই মাস—আমাদের শ্রাবণ। আজ দু'দিন থেকে ঘনঘোর বর্ষা নেমেছে। আজ বিকেলবেলা থেকে বর্ষণ ধরেছে কিন্তু রিমিঝিমি বর্ষণের বিরাম নাই। শহরের পথঘাট জনহীন বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। হাওড়া শহরের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বড রাস্তা। এ রাস্তার উপর আগের কালে দোকানপাট বড় একটা ছিল না কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে যেকালে কলকাতা বাড়ছে স্ফীতকায় দৈত্যের মত সে-কালে তার ছোঁয়াচে হাওড়াও প্রায় তার সঙ্গে তাল রেখেই বাড়ছে। সেকালে হাওড়ার এসব রাস্তার উপরের লোকেরা কথায় কথায় বলত—কলকেতার চাল এখানে মেরো না।। এ হল হাওড়া। এখানে যা ইচ্ছে তাই চলে না। সমাজ আছে। এখনও শোনা যায় দু'চারজন প্রবীণ বা প্রবীণা বলেন—পাড়ায় কি আর সমাজ আছে না মানুষ আছে। বলব কাকে? এখন এই রাস্তাটার উপরের বাড়িগুলোর নিচের তলার ঘরগুলো ক্রমে ক্রমে দোকানে পরিণত হচ্ছে। সাইন-বোর্ড পড়েছে—তার মাথায় আলো জ্বলছে। আজ দোকানগুলো এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। আলো নিভেছে। রাস্তার আলোর কতকগুলো জ্বলছে কতকগুলো জ্বলছে না। ফলে রাস্তাটা আবছা আলো-আঁধারিতে থমথম করছে। সেই আবছা আলোআঁধারিকে পিঠের দিকে রেখে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। দরজা খুলতেই ঘরের আলো গিয়ে পড়ল ওপাশের বারান্দায়। বারান্দায় দাড়িয়ে ছিল মেয়েটি। মেয়েটিকে দেখে বিরক্তি এবং অস্বস্তির সীমা রইল না সুধাংশুবাবুর! মেয়েটির চেহারার মধ্যেই ছাপ ছিল। মুখে চোখে ঠোটে বেশে ভূষায় একটা পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সে পরিচয় ওই প্রেতিনীর পরিচয়। বেশ পরিপাটী করে পরা পরিচ্ছন্ন ফিতেপাড কাপড়ে, চিকনের কাজকরা সাদা টাইটহাতা ব্লাউজে, ব্লাউজের নিচে ব্রেসিয়ারের আভাসে, মুখের চারি-পাশে খোলা চুলের রাশি অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে থাকলেও সমস্ত কিছুর মধ্যে এমন একটা ছন্দবিন্যাস পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে যা বলে দেয় এ মেয়ে সধবা হোক বিধবা হোক এ মেয়ে স্বভাবে প্রেতিনী। আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টিতে এবং চোখের কোল ঘিরে কালো একটি ছায়াবেষ্টনী দেখলেই বোঝা যায় যে, এ কালো ছায়াবেষ্টনী বহু রজনীর অন্ধকারের কাজললতা থেকে আহরণ করা ছোপ। ঠোট দুটির উপরেও পড়েছে শ্যাওলার মত একটা কালো ছোপ। এ ছাড়াও মেয়েটিকে সুধাংশুবাবু চেনেন। সত্যিই তার যে পরিচয় তা প্রেতিনীর পরিচয় ছাড়া কিছু নয়।

সুধাংশুবাবু ওকে চিনেছেন।

দু'পা পিছনে সরে এলেন তিনি।

মেয়েটি কিন্তু নড়ল না। মুখখানা তার আশ্চর্যভাবে সকরুণ হয়ে উঠেছে। সুধাংশুবাবু বুঝতে পারছেন না কি বলবেন! বলবেন—কে তুমি? কেন তুমি এসেছ? কিন্তু তা' বলতে পারছেন না। মনে পড়ছে আর এক রাত্রির কথা।

মেয়েটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়েই ছিল; বোধ করি সুধাংশুবাবুর এতটুকু সস্নেহ অনুগ্রহসূচক কোন একটা কথার প্রতীক্ষা করছিল। তা' না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই কথা বললে। বাঁ হাত দিয়ে মাথার ঘোমটাটা একটু সামনে টেনে দিয়ে বললে—আমি—।

বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। থেমে গেল, কথা আটকে গেল।

সুধাংশুবাবু অত্যন্ত তিক্তকণ্ঠে বললেন—বল। আমি—। ধরিয়ে দিলেন কথাটা।

মেয়েটি বললে—আমার নাম—।

সুধাংশুবাবু আরও তিক্তকণ্ঠে বললেন—তুমি চাঁপা। ভাল নাম বোধ হয় রত্নমালা।

তাঁর কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা জেগে উঠেছে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে।

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ।

সুধাংশুবাবু বললেন—এই রাত্রে কি দরকার তোমার? আজ যাও। কাল সকালে এস।

মেয়েটি ডানহাতে কাপড়ের আঁচল খানিকটা মুঠো করে ধরে মুখের উপর চেপে ধরলে। তাতে কান্নার শব্দ চাপা দেওয়া গেল কিন্তু চোখের জলের অস্তিত্ব গোপন করা গেল না। দু'চোখের কোল থেকে বাঁধভাঙা জল নেমে আসছে।

সুধাংশুবাবু বললেন—একি? কাঁদছ কেন তুমি?

এবার চাঁপা বললে—আমার বড় বিপদ বাবু! বড় বিপদ! এরপরই আকুল আর্তিতে হাত দুটি জোড় করে অতি কাতর করুণ কণ্ঠে সে বললে—আমাকে আপনি বাঁচান!

আবার বিরক্ত এবং তিক্ত হয়ে উঠলেন সুধাংশুবাবু। বললেন—কি বিপদ! সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তখন অনেক বিচার তাঁর হয়ে গেছে। এই মেয়েটির কোন্ বিপদ হতে পারে? এবং কোন্ বিপদ থেকে তিনি তাকে বাঁচাতে পারেন? এর উত্তর স্বতঃসিদ্ধ। কোন কেসে পড়ে থাকবে। ফৌজদারী কেস। যে জীবন সে যাপন করে তাতে কেসে পড়াই স্বাভাবিক। এবং তিনি অ্যাডভোকেট। হাওড়া কোর্টে ক্রিমিন্যাল সাইডে প্র্যাক্টিস তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত। সেসনস্ কোর্টে বড় বড় কেস—মার্ডার কেস ডাকাতি দাঙ্গার কেসে তিনি আসামী পক্ষে থাকেন। এবং শতকরা ষাটটা কেসে তিনি জেতেন। সুতরাং যে-বিপদে তিনি বাঁচাতে পারেন সে-বিপদ ওই ধরনের কোন কিছু ছাড়া আর কি হতে পারে। তিনি বললেন—কোন কেসে পড়েছ বুঝি?

মেয়েটি আবার কেঁদে উঠল।

সুধাংশুবাবু আবার বললেন, এবার কণ্ঠস্বর রূঢ়তর হয়ে উঠল, বললেন—এতদিন কিছু হয়নি এই আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে জিভ দিয়ে করুণাব্যঞ্জক একটি শব্দ করে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। সেটা আক্ষেপও বটে আবার তিরস্কারও হতে পারে।

চাঁপা মাটির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। শুধু এই তিরস্কারের ফলে তার চোখের জল শুকিয়ে গেল; সে শুকনো চোখে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুধাংশুবাবু আবার তিরস্কার করলেন—জীবনটাকে নিয়ে কি করলে বল তো? এবার তাঁর কণ্ঠস্বর যেন অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু তৃপ্তি পেলেন তিনি। আজ বারো বছর এই তিরস্কার এই মেয়েটিকে করবার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন।

সুধাংশুবাবু বলে গেলেন—কি কেস জানি নে। তবে তোমাদের কেস—। থেমে গেলেন তিনি। প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—তুমি কাল সকালে এসো। আজ শনিবার। আজ সন্ধ্যেবেলা কোন কাজ আমি করি নে। তোমার অন্ততঃ জানা উচিত। এ পাড়ার তো সকলেই জানে এ কথা! অন্ততঃ বারো বছর তোমাকে আমি দেখছি। তুমি নিশ্চয় জান যে আমি শনিবারে কোন কাজ করি নে!

সুধাংশুবাবু—সুধাংশুমোহন চক্রবর্তী নামজাদা অ্যাডভোকেট। হাওড়া জজ কোর্টে সেসনস্ কোর্টে যাঁরা প্রথমসারির আইনজ্ঞ তিনি তাঁদেরই একজন। হাওড়া জেলারই লোক, হাওড়া জেলা স্কুলেরই ছাত্র, বাপ ছিলেন নরসিংহ কলেজের অধ্যাপক—তিনি হয়েছেন উকীল। এককালে দেশের মুক্তি-আন্দোলনেও যুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু সে কথা থাক। সে সব পুরনো কথা।

শনিবার সন্ধ্যা এবং রবিবার সকাল তাঁর ছুটি। পেশাগত কাজ থেকে ছুটি—মক্কেলের কাগজ-পত্র ছোঁয়া দূরের কথা তাদের সঙ্গে দেখাও করেন না। এই দুটি বেলা তিনি মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নেন। তাঁর ক্লার্করা আসে কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা তিনি করেন না। শনিবার সন্ধ্যে-বেলাটা একা থাকেন। ভাবেন, লেখেন। লেখা অভ্যাস আছে—প্রবন্ধ লেখেন। স্টেটস্‌ম্যান অমৃতবাজার পত্রিকায় রাজনৈতিক দার্শনিক বিষয়ে লিখে থাকেন ছদ্মনামে। কখনও কখনও বড বড বই নিয়ে একমনে পড়ে যান। তারপর তার উপর নিবন্ধ লিখে থাকেন। সন্ধ্যেবেলা বসেন—ওঠেন সেই রাত্রি বারোটায়। কাপ ছয়েক চা খেয়ে থাকেন আর সিগারেট পোড়ান চার ঘণ্টায় ষোলটা থেকে কুড়িটা। সাড়ে এগারটা থেকে স্ত্রী এসে তাগিদ দিতে থাকেন—ওঠো ওঠো।

উঠি উঠি করেও আধঘণ্টা কাটিয়ে ক্লক ঘড়ির বারোবার ঢং ঢং ঘণ্টার তাগিদে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে আড়ামোড়া ছাড়েন।

আগের কালে অর্থাৎ প্রথম জীবনে—প্র্যাকটিসের যখন প্রথম এবং তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে যখন নবীন নবীনা তখন স্ত্রী বলতেন—আর কত বসে থাকব আমি? এখন বলেন—কাল কি তোমার কোর্ট নেই বলে অন্য কাজকর্মও নেই? বাগানে যেতে হবে না? বা গ্রামে যাবে না?

রবিবার সকালে তিনি গ্রামের বাড়িতে যান কোনদিন, কোন রবিবার যান তাঁর বাগানে। মাইল বিশেক দূরে বাগান বা চাষবাড়ি করেছেন সুধাংশুবাবু।

শনিবার সন্ধ্যায় সুধাংশুবাবু প্রফেশনাল কাজ করেন না এটা হাওড়ার লোকে জানে। তাঁর বাড়ির বাইরে ফটকের গায়ে বারান্দায় এসব বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। আজ নেমপ্লেটের পাশে লেখা আছে -বাড়ি নেই। বারান্দার গায়ে একটা বোর্ডে লেখা আছে—শনিবার সন্ধ্যায় কোন কাজ হয় না।

চাঁপা বারো বছরেরও বেশী কাল এই পথ ধরে যাতায়াত করেছে। চাঁপার মা সামনে ওই

বাড়িতে, অধুনা মৃত নিত্যবাবুর বাড়িতে কাজ করত। এই রাস্তার উপর সুধাংশুবাবুর পৈতৃক বাড়ি তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ হয়েছে। দোতলা থেকে তেতলা হয়েছে। গ্যারেজ হয়েছে। গাড়ি হয়েছে।

চাঁপা বললে—শনিবার জেনেই আমি এসেছি।

বিস্ময়ের আর সীমা রইল না সুধাংশুবাবুর। বললেন—শনিবার জেনেই এসেছ? কেন?

চাঁপা বললে—জেনেই নয়, জেনেও এসেছি। আমার যে উপায় নেই। কি করব?

ক্রুদ্ধ হয়ে সুধাংশুবাবু কিছু বলতে গেলেন কিন্তু মেয়েটি বাধা দিয়ে বললে—কিছু মনে করবেন না। একটি মেয়ের বাড়ি। হয়তো সে খারাপ মেয়েই। বাইরে দাঙ্গাহাঙ্গামা। সেই সময় রাত্রিকালে কোন বিপন্ন পুরুষ যদি সেই মেয়ের বাড়ি আশ্রয় চায় তবে বুঝতে হবে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আশ্রয় চাচ্ছে। আশ্রয় দিলে মানুষটা বাঁচে। আর ক্ষতিও তাতে কিছু হয় না।

সুধাংশুবাবুর অন্তরাত্মা রাগে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ফেটে পড়তে চাইলে; সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংবরণ করলেন তিনি। বললেন—মনে করিয়ে দিতে হবে না। সে কথা আমার মনে আছে। আমি ভুলি নি।

এবার এই কথায় সে-এক আশ্চর্য বিষণ্ণ হাসি মেয়েটির মুখে ফুটে উঠল। মাত্র দুটি ঠোঁটের তটপ্রান্ত-রেখাতেই তা আবদ্ধ। তার সঙ্গে তার দুই চোখে জল। গ্রীষ্মের সমুদ্রে ভাটির শেষতম মুহূর্তটিতে ক্লান্ততম ঢেউটি এসে লুটিয়ে গড়িয়ে পড়ার মতই এ হাসির চেহারা। অনুদ্ধত তো বটেই তার সঙ্গে লজ্জাও অনেক। লজ্জিতভাবেই সে বললে—না, সে কথা আমি মনে করিয়ে দিতে চাই নি। সে আপনি ভাববেন না। আমার সে স্পর্ধা নেই। বারো বছর ধরেই তো আপনার সামনে দিয়ে গিয়েছি ওই ওঁদের বাড়ি—কোনদিন আপনার সঙ্গে কথা বলতে তো চাই নি। আমি যা তা' তো আমি জানি। সেদিন সেই বারো বছর আগে সেই রাত্রে সেই ক'ঘণ্টার জন্যে শুধু ঘরের মধ্যে বসতে দিয়েছিলাম—আমার সারাজীবনে সেইটুকুই একমাত্র পুণ্য। সে আমার থাক। আমি এমনি এসেছি—কত লোককে তো বাঁচান—।

সুধাংশুবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

বারো বছর আগের কথা। ১৯৪৮ সাল তখন। সারা দেশটা তখন জ্বলছে। ইংরেজ চলে যাচ্ছে। দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীন হচ্ছে। বাংলাদেশ কেটে দু'ভাগ হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ব পাকিস্তান; পূর্ববঙ্গে হিন্দুর বাড়ি জ্বলছে, লুট হচ্ছে, পুরুষেরা খুন হচ্ছে, মেয়েরা হারাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গেও তাই। তবে মুসলমানের মেয়ে এখানে হারায় নি এটা বলতেই হবে।

কলকাতা হাওড়ায় সে আগুন পরিণত হয়েছিল রাবণের চিতায়। রাবণের চিতার আগুন অনির্বাণ। ও নেভে না। এই তো পঞ্চাশ বছর আগেও লোকে বিশ্বাস করত সে আগুন আজও জ্বলছে। সুধাংশুবাবুর বয়স তখন চৌত্রিশ। ১৯৬০ সালে অর্থাৎ আজ তাঁর পঞ্চাশ বছর চলছে। ষোল বছর আগে চৌত্রিশ ছিল। কথা চৌত্রিশ বত্রিশ 'ছত্রিশ নয়, কথা সে সময়ের সুধাংশুবাবুর কথা। বয়স যতই হোক তখন তিনি নবীন এবং দীপ্ত। তখন প্র্যাকটিসে

বসেছেন কিন্তু প্র্যাকটিস তখনও তাঁকে বাঁধতে পারে নি। তখনও তাঁর গা থেকে পলিটিক্যাল পার্টির ছাপ ওঠে নি, আটক-আইনে বন্ধ থাকলেও চেহারায় একটা যে ছোপ পড়ে সেটাও তখন সম্পূর্ণ মোছে নি। দেশ ভাগ হবার মাস ছয়েক আগে ছাড়া পেয়েছেন। এবং একটা অনিবার্য অভ্যুত্থান বা সশস্ত্র বিপ্লবের সংগ্রাম আসন্ন ধরে নিয়ে মনে-মনে তাতেই মেতে ছিলেন। হাওড়ার বার লাইব্রেরী বাংলাদেশে হাইকোর্টের বারের পরই গুরুত্বপূর্ণ বার। এখানে অনেক আইনজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্ব করে গেছেন। হাওড়া শহরও বাংলার রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের জটিল এক কেন্দ্র। এক সেকালের ফরাসীদের এলাকা চন্দননগর ছাড়া হাওড়ার মত শক্ত ঘাঁটি এবং আশ্রয় বিপ্লববাদীদের আর ছিল না। আবার অন্যদিক থেকে ই. আই. আর.—এখন ই. আর., বি. এন. আর.—এখন এস. ই. আর. এর টারমিনাস স্টেশন ও প্রধান স্টেশনের ইয়ার্ড হিসেবে ও তার সঙ্গে গঙ্গার ধারের জুট মিলগুলোর অস্তিত্বের জন্য হাওড়ার সাধারণ জীবন যেমন উত্তপ্ত তেমনি নিষ্ঠুর ও রূঢ়। আগুন এখানে সহজেই জ্বলে ওঠে। ব্লাস্ট ফার্নেসের উগরে দেওয়া জ্বলন্ত লোহার ময়লা, কিংবা বয়লারের ধোঁয়ানো ছাই-ফেলা জায়গার মত অবস্থা।

দেশভাগের আগুন তখন জ্বলছে। সে প্রায় দাউদাউ করে জ্বলা। রাজনৈতিক মতবাদে বামপন্থী সুধাংশুবাবুর দল সে-আগুন নেভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বাতাস যে আগুনকে শুকনো চাল-বস্তির উপর দিয়ে বইয়ে নিয়ে চলে মানুষ সেখানে ফায়ার ব্রিগেডের মত যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে লড়াই দিয়েও তাকে রুখতে পারে না। তার উপর খড়ের চালের ঘরগুলো যদি গরীবের সংগ্রহ করা খড়কুটো ডালপাতার জ্বালানিতে অথবা পাটে খড়ে বোঝাই থাকে তাহলে সে আগুনের সামনে মানুষকে ক্রমাগত পিছু হটতে হয়। হাওড়ার বস্তির কতক কতক জায়গার উপমা ঠিক ওই খড়কুটো ডালপাতার জ্বালানি বোঝাই খড়ের চাল-বস্তির মত। অপরাধ-প্রবণ একদল মানুষ, পুলিসের কালো খাতায় নাম লেখানো আসামী যারা, তারা এই সুযোগে সমাজের পরিত্রাণকর্তা সেজে বসে অপেন আপন অঞ্চলে অবাধ কর্তৃত্ব চালিয়ে চলেছে তখন। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন অনেক পরিত্রাতার অভ্যুদয় হয়েছে তখন।

এমন দিনে সে দিন; যে দিনটির কথা বললে চাঁপা; যে দিনের পর আর সে তার সামনে আসে নি; সেইদিন বিকেলবেলা নবীন সুধাংশুবাবুর কানে এল একটা নিষ্ঠুর খবর। হাওড়ার উত্তর অঞ্চলে আজ একটা সুরক্ষিত মুসলমান পল্লী আক্রান্ত হবে। পল্লীটি কয়েকবার আক্রান্ত হয়েও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। এবার আক্রমণকারীরা শপথ নিয়েছে আগামী কাল সকালে এই পল্লীটি কোনমতেই মাথায় চাল নিয়ে এবং বস্তির মধ্যে জীবনের স্পন্দন নিয়ে আর খাড়া থাকবে না। যা থাকবে তা খাপরা এবং খড়ের চালের ভস্মাবশেষ—ছাই আর কালো রঙধরা ভাঙা ঘরের দেওয়াল। মানুষগুলো মরবে—তাদের লাশ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে; যারা পালাবে তারা পালাক।

পল্লীটির কেন্দ্রে আছেন একজন পশ্চিমদেশীয় অবস্থাপন্ন মুসলমান ব্যবসায়ী। এখানে তাঁর কয়েকটা প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা আছে। দোতলা পাকা বাড়ি আছে এবং বাড়ির মধ্যে একটা বড় আয়রন-চেস্ট আছে যেটাকে তিনি টাকায় নোটে বোঝাই করে রেখেছেন। মুসলিম লীগ আমলে

লীগের কর্তাদের সঙ্গে তাঁর খাতির ছিল অনেক—এখন পুলিসের সঙ্গে খাতির জমিয়ে রেখেছেন। এ ছাড়া অনেকে বলে ওই একচেটিয়া ব্যবসার খাতিরে অকস্মাৎ ধর্মমতের উর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও মেলামেশা করেছেন। বোমা মজুত করে রেখেছেন। লোকজনও রেখেছেন।

এ সবকেই আজ উচ্ছেদ করতে হিন্দুদের একটা অংশ বদ্ধপরিকর। এ নাকি আজকের দিনে লজ্জার কথা। হার মানার লজ্জায় হাওড়ার মুখ কালো হয়ে গেছে। সেই লজ্জা মুছবার জন্যে সে বছরের সেদিনের আয়োজন কুরুক্ষেত্রে সপ্তরথী সমাবেশে চক্রব্যূহ রচনার মত একটা আয়োজন। টাকাকড়ি লোকজন পৃষ্ঠপোষক নেতা কিছুরই অভাব ছিল না।

খবরটা যেন কোর্ট এলাকা থেকেই ফিসফিস করে এ কোণে ও কানাচে উচ্চারিত হচ্ছিল। সময়টা গুজবের সময়ও বটে। সুতরাং সঠিক কোন সংবাদ পেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কোর্ট-ফেরত সুধাংশুবাবু কোর্টের পোশাক খুলেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের আড্ডার দিকে।

আড্ডায় কর্মীরা গুম হয়ে বসে ছিল। করার যেন কিছুই নেই। কতকগুলো ব্যবসাদার সমস্ত উদ্যোগের পিছনে দাঁড়িয়েছে; তাদের লক্ষ্য ওই মুসলমান ভদ্রলোকটির ওই একচেটিয়া ব্যবসা। তার সঙ্গে যারা নেতা হিসেবে দাঁড়িয়েছে তাদের লক্ষ্য ওই আয়রন-চেস্ট এবং আরও একদল আছে যারা চোখ রেখেছে আগামী কাল যে বস্তিটা পোড়াবস্তি হবে সেইটের উপর। এদের সবার পিছনে আছেন বস্তির মালিক যিনি তিনি। গোটা পাড়াটা খেপেছে। বাইরে থেকেও লোক আসছে।

আজও মনে আছে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল সুধাংশুবাবুর। শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি হবে ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের? মনে পড়ছে রবি বলে একটি অল্পবয়সী ছেলে বলেছিল - দেশটা কি ফ্যাসিস্ট হয়ে গেল সুধাংশুদা?

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মেয়েটি বললে—আপনার কাছে সেদিন রাত্রে আমার কুৎসিত চেহারা আমি লুকোই নি। লুকুতে আমি পারতাম। কিন্তু আপনার জন্যেই আমি লুকুই নি। আপনার ক্ষতি হত, অনিষ্ট হত।

—হ্যাঁ, তা হত।

ছুরি কিংবা বোমা কিংবা লাঠি ডাণ্ডার ঘায়ে জখম হতে হত। প্রাণান্ত হলেও হতে পারত। সেদিন রাত্রে তাঁদের দলের আড্ডায় বিপ্লবের ব্যাকরণ নিয়ে এবং ভারতবর্ষের এত পুণ্যের স্বাধীনতার তপস্যা নিয়ে আলোচনার মাঝখানেই বোমা ফাটতে শুরু করেছিল। ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা, বিনয় বাদল দীনেশ, চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্য সেনের দৃষ্টান্ত কোন্ ভুলে এমনভাবে দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাবাজদের বিক্রম ও প্রতাপের কাছে ম্লান হয়ে গেল সেই কথা হতে হতেই দমাদম বোমার আওয়াজ শুরু হয়ে গেল। বুঝতে বাকী থাকে নি বস্তিওয়ালা ব্যবসাদার এবং ধর্মান্ধ মানুষদের জোটের জেহাদ আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথম শব্দেই চমকে উঠেছিল সকলে।

—আরম্ভ হয়ে গেল ?

একজন ঘড়ি দেখে বলেছিল—এই তো সবে সাড়ে আটটা—এত সকালে—

—তার মানে পুলিস একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে।

ওদিকে কোলাহল উঠেছিল। তার অর্ধেকটা পৈশাচিক হিংসার উল্লাসের কোলাহল আর অর্ধেকটা আর্ত সকরুণ।

সকলেই প্রায় একসঙ্গে এক সংকল্পে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

সংকল্প—এই বর্বর হৃদয়হীন পৈশাচিক আক্রমণকে বাধা দিতেই হবে। রাজনৈতিক চেতনায় সচেতন মন—দুর্ধর্ষ সাহস—নূতন যৌবন, তাঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন ঘর থেকে।

তখন আগুন জ্বলছে। এবং মানুষের সে বীভৎস-উন্মত্ততা, হিংসার সে প্রচণ্ড ভয়াল রূপ বস্তির চালের দাউদাউ আগুনের মত ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতর হয়ে উঠেছে। যে আগুন আলোর মুখে শিখা হয়ে জ্বলে, অন্ধকারে পথ দেখায়, সেই আগুন ঘরের চালে লাগলে মানুষের ভয় হয়। সেই আগুন যখন এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয় তখন দূর থেকেই তার আঁচে মানুষের দেহ ঝলসায় আত্মা সংবিৎ হারায়। তাদেরও সংবিৎ হারিয়েছিল সেদিন। ওদিকে তখন পাকাবাড়ি থেকে থেকে বধির মুসলমানটি গুলি চালাচ্ছেন।

একজন শান্তিকামী বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই গুলিতে আহত হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমনই অবস্থায় জন সাতেক— ।

হ্যাঁ, তাঁরা সাতজনই ছিলেন। সাতজনেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পাড়াটার সামনে। মনে পড়ছে চীৎকার উঠেছিল পাড়ার ভিতর থেকে "নারায়ে তকদীর। আল্লা হো আকবর।". তার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের ভয়ার্ত কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এদিকে বাইরে আক্রমণকারীর দল চেঁচাচ্ছিল। অর্থহীন ভাবে কয়েকটি অতি পবিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করে তার সঙ্গে বুকের কথা প্রকাশ করছিল, অকুতোভয়ে কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে চীৎকার করে বলছিল—মার মার মার। লাগাও আগুন। জ্বালাও।

এঁরা সাতজনেই চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন—না না— । শোন— শোন ভাই সব—

মুহূর্তে একটা বোমা এসে আছড়ে পড়েছিল সামনে। বোমা নয়, ক্র্যাকার। প্রচণ্ড শব্দ করে ফেটে ঠাঁইটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। গুণ্ডার দল কুৎসিত ভাষায় তাঁদের গালাগাল দিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল—নিকাল শালারা এখান থেকে নিকাল।

আর একজন বলে উঠেছিল—দে, শালাদের ধরে হাত পা বেঁধে ওই আগুনে ফেলে দে।

তাঁদের দলের সব থেকে ছোট ছেলেটি এই মুহূর্তটিতেই সব থেকে মারাত্মক ভুল করে বসেছিল। তার জামার তলায় লুকানো ছিল একটা—ক্র্যাকার নয় বোমা; সেই বোমাটা সে ছুঁড়েছিল ওই বক্তার দিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু হল বিপরীত। বোমাটা এমন ভাবে ফাটল যে তার স্প্লিন্টারগুলো এসে লাগল তাকেই এবং দুটো একটা লোহার টুকরো ওদের দলের দু'একজনকে আহত করে দিলে। ছেলেটা নিজে রক্তাক্ত হয়ে সেইখানে লুটিয়ে পড়ে গেল। এরপর সে এক প্রেততাণ্ডব। গুণ্ডার দল ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের দলকে আক্রমণ করলে। সে আক্রমণের মুখে

দাঁড়িয়ে মরার মত সাহস ছিল কি ছিল না সে কথা সেদিনও ভাবেন নি, আজ অকস্মাৎ যেন ভেবে দেখতে ইচ্ছে হল একবার।

মন বলছে—হ্যাঁ, সাহস ছিল। কিন্তু অন্য সকলে সম্ভব অসম্ভব হিসেব করে বলেছিল—"লড়াই করা অসম্ভব। এবং এভাবে গুণ্ডার হাতে মরে কোন লাভ হবে না। আমরা মলে ওদের মনে এতটুকু দাগ কাটবে না।" সেই কারণেই সেদিন ঘুরে দাঁড়িয়ে ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াইয়ে যা হতে পারত তার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াতে পারেন নি।

সেদিন তা দাঁড়ালে এই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হত না। দেখা হয়ত হত কিন্তু তাকে ঠিক এইভাবে চিনতেন না! এ চেনা যে কত বড়—; কি বলবেন—? লজ্জার? দুঃখের?

যাক, ছুটে পালিয়েছিলেন সকলে। জখম হওয়া ছেলেটাকে নিয়ে পালানো খুব সহজ কথা ছিল না। কিছুটা দূর এসেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিলেন সকলে। গোটা পাড়াটার রাস্তায় আলো তখন সব নিভে গেছে। নিভিয়ে দিয়েছে ওরা। বাড়িগুলির দরজা জানালা বন্ধ। ভিতরেও আলোর আভাস ছিল না। রাস্তা জনহীন। পিছনে ছুটন্ত হিংস্র গুণ্ডার দল। গুণ্ডারা চোরাগোপ্তা গুণ্ডামি করে—সে সহ্য হয়ে গেছে মানুষের, সেখানে গুণ্ডাদের ধরা পড়ার ভয় আছে। আর এ হল গুণ্ডার অবাধ অধিকার। গুণ্ডামি হল এখানে বিশেষ অধিকার।

সুধাংশুবাবু ছুটছিলেন অন্ধকারের মধ্যে। বড় রাস্তা ছেড়ে সংকীর্ণ পথ ধরে এলাকাটা পার হয়ে আসতে চেষ্টা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। গলিটার ওমাথায় উঠেছিল কোলাহল—সেই আস্ফালন—

মার শালাদের—দে জ্বালিয়ে।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। কি করবেন? আবার পিছন ফিরবেন? কিন্তু যাবেন কোথায়? অতি সংকীর্ণ কোন গলিপথ—যে পথে মেথরেরা হাঁটে—এমন কোন পথও কি নেই?

নিঃসীম অন্ধকার আর ওই দাঙ্গার ছোট পাড়াটা তখন অন্ধকারের মধ্যে যেন দিকদিগন্তহীন হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে তিনি অতল জলে তলিয়ে হারিয়ে যাবার মতই ওই অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একপাশের একটা বাড়ির নোনাধরা ইটের দেওয়ালের গায়ের সাবেকী আমলের ছোট একটা জানালা খুলে গিয়েছিল। সুধাংশুবাবু অনুভব করেছিলেন জানালার ওপাশে কেউ আছে! আর শুনতে পেয়েছিলেন একটি বাচ্চার কান্না। বুঝতে দেরি হয় নি, যে ওপাশে রয়েছে সে কোন মেয়েছেলে। তবুও সুধাংশুবাবু বলেছিলেন বা বলে ফেলেছিলেন—আমাকে একটু আশ্রয় দিতে পারেন? গোলমালটা একটু থামলেই চলে যাব!

ফিসফিস করেই মেয়েটি বলেছিল—তুমি কে?

—নাম বললে কি করে চিনবেন? তবে আমি হিন্দু কিন্তু গুণ্ডার দলের হিন্দু নই। গুণ্ডারা আমাকে তাড়া করেছে। গলির দু'মুখে ঢুকে খুঁজছে।

শেষকালটায় হঠাৎ নামটা বলে ফেলেছিলেন—আমার নাম সুধাংশু। আমি হিন্দু।

—সুধাংশু! সেদিন মনে হয় নি কিন্তু পরে মনে হয়েছিল শব্দটি উচ্চারণের মধ্যে বিস্ময় ছিল।

সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—হ্যাঁ। মিথ্যে বলি নি আমি। কিন্তু দরজাটা খুলে দেন তো দিন নইলে পাশ দিয়ে কোন রাস্তা বলে দিন। ওরা গলিটার দু'মুখ আগলেছে।

খুব দ্রুত উচ্চারণে চাপা গলায় গৃহমধ্যবর্তিনী বলেছিল—দরজার সামনে আসুন। এই ডাইনে দরজা।

ঘরের মধ্যে এ পর্যন্ত সেই কাঁদুনে ছেলেটা এক-ধরনের ঘ্যানঘেনে কান্না কেঁদেই চলেছিল—হঠাৎ সে এবার ককিয়ে উঠল। কে যেন বললে, সেও মহিলা, একটু ভারী গলায় বললে—ছেলেটাকে মেরে ফেল তুই, ছেলেটাকে গলা টিপে শেষ করে দে! এ তরফ থেকে বলেছিল—তুমি থাম তো! চেঁচিয়ো না বেশী।

—ওকি—দরজা খুলছিস কেন? আজকের দিনেও কি তোর—

এবার মেয়েটি চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল—থাম বলছি মা তুমি থাম! দরজা খুলে না দিলে মানুষটাকে ওরা মেরে ফেলবে!

—ও মা—! তাই বলে তুই—। ও চাঁপা—চাঁপা—।

এদিকে দরজাটা খুলে গিয়েছিল। অন্ধকার দরজার মুখটায় শ্বেতবস্ত্রাবৃতা মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিলেন সুধাংশুবাবু। মেয়েটি বলেছিল- -ঢুকে পড়ুন, দেরি করবেন না।

বাড়ির মধ্যে এসেও তিনি মেয়েটিকে চিনতে পারেন নি।

কেরোসিনের ডিবে আর একটা কালিপড়া হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল মেয়েটির প্রসাধন এবং সজ্জাবিলাস বেশ একটু অসংগত। এই বাড়িতে এই পরিবেশে যারা বাস করে তাদের পক্ষে এ বিলাস এ সজ্জা শুধু বেমানানই নয়—মানে খুঁজতে গেলে একটা খারাপ অর্থই বার বার মনের মধ্যে গর্ত থেকে সাপের মত মুখ বাড়ায়।

তখন ওর বয়স ছিল বোধ করি বছর কুড়ি কি বাইশ, তার বেশী নয়।

মেয়েটি যে ঘরের জানালা থেকে কথা বলেছিল সেই ঘরেই সে তাঁকে এনে বসতে দিয়েছিল, বলেছিল—বসুন এইখানে।

হঠাৎ এতক্ষণে সুধাংশুবাবুর মনে হয়েছিল মেয়েটিকে যেন তিনি চেনেন—অন্ততঃ দেখেছেন। ভ্রূ কুঞ্চন করে মনে করতে চেয়েছিলেন কোথায় দেখেছেন।

ঘরখানার মধ্যে দুখানা তক্তাপোশ জোড়া দিয়ে তার উপর দুজনের বিছানা পাতা। দুজনের না, আড়াইজনের বিছানা--অর্থাৎ একজনের বিছানার পাশে একটি ছোট ছেলের বিছানা। বিছানায় শুয়ে একটা রুগ্ন ছেলে কেঁদেই চলেছে। বিরাম নেই—তার অসন্তোষের শেষ নেই, সে অসন্তোষ সে প্রকাশ করে চলেছে ওই কান্নার মধ্যে দিয়ে। ক্লান্ত তিক্ত—হয়তো তার সঙ্গে ক্ষোভও ছিল কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে যা ছিল তা দুঃখ এবং করুণা ভিক্ষা। ছেলেটার বয়স হয়েছে—বছর চারেক হবে। কিন্তু এত দুর্বল যে উঠতে পারছে না।

মেয়েটি কিন্তু তাকাচ্ছেও না তার দিকে। সে বাইরে চলে গিয়ে ঘরের কোণের রাণীগঞ্জ টাইলের বারান্দাটার উপর ঘরের দিকে একেবারে পিছন ফিরে বসে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সুধাংশু

বাবু ভাবছিলেন—মেয়েটি কে ? দেখা মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, দেখেছেন তিনি। কোথায় দেখেছেন ? কোথায় ? ক্রমশঃ মনে হচ্ছিল যেন বেশ চেনা। কিন্তু কে ? হঠাৎ ছেলেটা যাকে বলে একেবারে ককিয়ে ওঠা সেই ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল। সুধাংশুবাবু ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিছু হল নাকি ছেলেটার ? এবং প্রত্যাশা করছিলেন মেয়েটি এবার এসে ছেলেটিকে তুলে নেবে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়েটি চঞ্চল হয় নি। বাইরে সেই বয়স্কা মেয়েটি বলে উঠেছিল—দেখ কি হল ছেলেটার ? চাঁপা !

মেয়েটি তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাভরা কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল—মরুক—মরুক আপদটা মরুক। আমি পারব না—তুই দেখ ! ওটাকে ছুঁতে ঘেন্না লাগে আমার। সত্যিই সে নড়ে নি, যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই থেকেছিল। এসেছিল সেই বয়স্কা মেয়েটি, মাথায় ঘোমটা টেনে কালীতে কালো লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে ছেলেটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—ও মাঃ—মরে যাই মরে যাই—ওরে ডেয়ো পিঁপড়েতে কামড়ে ধরেছে রে। চাঁপা আয় আয়—ছাড়িয়ে দে ছাড়িয়ে দে।

আশ্চর্য মা।

সেই গাল সেই একমাত্র গাল বর্ষণ করতে করতে এবার এসে ঘরে ঢুকেছিল—মরুক। মরুক। মরুক। মরে যা তুই। মরে যা।

অবাক হয়ে সুধাংশুবাবু এই মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না।

মা বলেছিল —ওর অপরাধ কি বল।

অপরাধ যে কি তা' বলে নি সেই বিষাক্তজিহ্বা মা।

জিভে তার আশ্চর্য বিষ। কামড়াতে হয় না—জিভ থেকে যেন বিষাক্ত লালা ঝরে পড়ে, হয়তো ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই তিক্তমন এবং বিষাক্তজিহ্বা মা ছেলেটার কাছে এসে বলেছিল—কি হয়েছে ? ছেলেটা হাত তুলে দেখিয়েছিল। সে স্বল্প আলোতেও সুধাংশুবাবু দেখেছিলেন হাতের আঙুলে একটা ডেয়ো পিঁপড়ে কামড়ে ধরে ঝুলছে।

লণ্ঠনটা কাছে এনে মা নিষ্ঠুর টানে সেটাকে এবং আলোতে দেখেশুনে আরও একটা পিঁপড়েকে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে নিজের পা দিয়ে পিষে মেরেছিল নিষ্ঠুর আক্রোশে।

লণ্ঠনটা তুলে ধরে মুখ নামিয়ে যখন মেয়েটি ছেলেটার কোথায় পিঁপড়ে ধরেছে দেখছিল সেই সময় আলোর আভা বেশ উজ্জ্বল হয়ে তার মুখের উপর পড়েছিল। তার যে একটি অশোভন প্রসাধনবিলাসিতার ও বিলাসসজ্জার আভাস তাঁর এবাড়ি ঢুকবার মুখেই চোখে পড়েছিল এবার সেটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেটা আর সেটুকু বলে এতটুকু কিছু নয়, সেটুকু যেন অনেকটুকু।

মেয়েটিকে ভাল দেখতে পান নি তিনি। এবার দেখলেন মেয়েটি পূর্ণযুবতী এবং আশ্চর্য একটি আকর্ষণ আছে তার, তার উপর তার কেশপ্রসাধনে এবং বিলাসসজ্জায় একটি ঘোষণা আছে।

তবুও ঘরখানির মধ্যে বিপণি সাজাবার মত কোন আয়োজন নেই। একটা দৈন্য ফুটে রয়েছে চারিদিকে। গৃহস্থঘরের পরিবেশ চারিপাশে অত্যন্ত স্পষ্ট। এর মধ্যে বেমানান একমাত্র সেই মেয়েটি নিজে। হঠাৎ চোখ ফুটল তাঁর।

মেয়েটির বেশভূষায় প্রসাধনে বিলাসের ও লালসার যে ঘোষণাই থাক, মেয়েটির পরনের বেশভূষার রঙের ঔজ্জ্বল্য নেই। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কপালে টিপ নেই। সাদা সিঁথি ঘিরে একরাশি চুল নিয়ে যে পরিপাটী কেশপ্রসাধন সে করেছে তার কাছে সিঁদুর কুমকুম লিপস্টিক বিচিত্রিত অনেক মুখ লজ্জা পাবে। পরনে সাদা ব্লাউজ—সাদা জমি ফিতেপাড় শাড়ি।

ছেলেবেলা মনে পড়ল—মিনার্ভায় শান্তি কি শান্তি নাটক অভিনয় দেখেছিলেন। তাতে বিধবা মেয়ে 'ভুবন' ভ্রষ্টা হয়ে সাদা থান আর সাদা সায়া ব্লাউজে যে অপূর্ব মোহিনী রূপ ফুটিয়ে তুলেছিল তাকে দেখে নায়ক মেয়ের বাপ চমকে উঠেছিলেন এবং বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে অর্থাৎ মেয়ের মাকে বলেছিলেন—"ভুবনের বিবি-রূপ দেখে এলাম। মেয়ের অলঙ্কার খুলতে সিঁথির সিঁদুর মুছতে কেঁদেছিলে তুমি। ভুবনকে এবার একবার দেখে এসে চক্ষু সার্থক কর।"

সেই রূপের আভাস এখনও মেয়েটির সর্বাঙ্গে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছে তাড়িয়ে দি। কিন্তু না, তা তিনি পারেন না। হ্যাঁ, তা তিনি পারেন না।

সেদিনও রাত্রে এ মেয়েটির উপর দারুণ ঘৃণায় তিনি চলে আসতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ছে -- ঠিক এই মুহূর্তেই—কেউ একজন সেই জানালা যে জানালাটা খুলে মেয়েটি তাঁকে দেখেছিল এবং তিনিও তাকে দেখে আশ্রয় চেয়েছিলেন সেই জানালায় টোকা দিয়েছিল কেউ। চমকে উঠে শঙ্কিত হয়েছিলেন তিনি।

তাঁর চোখের সামনে একটু দূরে মা এবং মেয়ে পরস্পরের দিকে নিষ্পলক নির্বাক হয়ে তাকিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। চারটি চোখের দৃষ্টি থেকেই যেন আতঙ্ক ডাক মারছিল।

টোকা বা শব্দ আরও জোরে পড়েছিল। মেয়ে এবার আর্তকান্নাকাঁদা ছেলেটাকে মায়ের কোলে দিয়ে বলেছিল—আরও জোরে কাঁদা এটাকে।

কাঁদাতে হয়নি—ছেলেটা আপনিই কেঁদেছিল। ছেলেটাকে ভাল করে দেখেছিলেন এবার ; রোগা অযত্নশীর্ণ দেহ। দিদিমার কোল থেকে ভেঙে পড়ে ঝুঁকে মায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। কান্নার চীৎকার ক্রুদ্ধ এবং উচ্চ হয়ে উঠেছিল।

মেয়েটি জানালার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলেছিল—আপনি একটু নেমে বসুন---এই তক্তাপোশের নিচটায়। একটু আড়াল দিয়ে বসবেন। আমি জানালা খুলব —ওরা দেখতে পেলে বিপদ হবে।

সুধাংশুবাবু তাই বসেছিলেন।

মেয়েটি জানলা খুলে বলেছিল—কি ? কি বলছ কি ? এই দাঙ্গার মধ্যে আমি বাড়ি থেকে পা বের করব না।

—নেহি নেহি। মালিক সাব বলিয়ে দিয়েছেন কুছ ডর না করবেন। কুছ ডর নেহি না। কোই হামলা হোগা তো হমি লোক দেখে গা।

—আচ্ছা।

—আউর সাহাব তিন-চার রোজ আসবেন না।

—আচ্ছা। বলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল মেয়েটি।

বাইরের লোক দুটির আরও কিছু কথা এরই মধ্যে ছিটকে এসে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। যার অর্থ—মালিক সাহাব শারোয়ার উপর শয়তান খুশী হায়। দেখ্‌না ক্যায়সা এক ঔরৎ কব্জা করিয়েছে।

শেষ কথা শুনেছিলেন—হ্যাঁ, তবু বলতে হবে লোকটা জাঁদরেল বটে আর দিলওয়ার আদমী। কথাগুলো আশ্চর্যভাবে অর্থসমন্বিত হয়ে উঠছিল তখন সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে। তিনি তক্তা-পোশের ধারে গুঁড়ি মেরে মাথা নামিয়ে বসেছিলেন। প্রথমেই নাকে ভক করে একটা গন্ধ এসে পৌঁচেছিল। তারপরেই চোখে পড়েছিল একটি বোতল।

গন্ধ মদের এবং বোতলও মদের। কিন্তু মূল্যবান বিলিতী মদের। ওদিকে কানে আসছিল ওই সব কথাগুলি। মেয়েটি বিচিত্ররূপিণী হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে। জানালা বন্ধ করেই মেয়েটি বলেছিল—এবার উঠুন। বসুন ভাল করে। আর কেউ আসবে না।

সুধাংশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বসেন নি, দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলেছিলেন—না, আমি এবার যাব।

—যাবেন? চমকে উঠেছিল মেয়েটি। তারপরই তার কপাল কুঁচকে উঠেছিল এবং বলেছিল—যাবেনটা কোথায়?

—বাড়ি—আমার বাড়ি এখান থেকে খুব দূর নয়।

—সে জানি। কিন্তু তা হলেও এখন যাওয়া যায় না। যাদের ভয়ে এখানে ঢুকেছেন তারা গলিতে রয়েছে।

—তা থাক। সে ব্যবস্থা আমি করব। তার জন্যে ভেবো না তোমরা।

মেয়েটির চোখের পাতা দুটো চকিতে বিস্ফারিত হয়ে যেন ঝলসে উঠেছিল, বলেছিল—অ। তার জন্যে ভাবতে হবে না মানে আপনার জন্যে। তা না হয় ভাবলাম না কিন্তু আমাদের জন্যে আমরা ভাবব তো! না—তাও পাব না!

—মানে?

—ওরা যখন দেখবে কি জানতে পারবে আপনাকে আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম তখন আমাদের হবে কি সেটা ভাবতে পারেন না পারেন না!

সুধাংশুবাবু সেই মন্ত্রপড়া সাপের মত মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। রাত্রি দুটো পর্যন্ত বসে থাকতে হয়েছিল। তারা নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। তিনি মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। শুধু ওই ছেলেটা ক্রমান্বয়ে কেঁদে গিয়েছিল অশ্রান্ত কান্না।

আর এই বিষাক্তজিহ্বা নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর ক্রোধে বার বার বলেছিল—মর মর, তুই মরে যা।

সুধাংশুবাবু ক্ষুব্ধ চিত্ত নিয়েই অসহায়ভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন।

বাইরের গলিপথটাই একরকম দাঙ্গার কেন্দ্র, বস্তিটার দক্ষিণ সীমানার শেষ প্রান্ত। গলিটার ওমাথায় এমাথায় হাঁকাহাঁকি চলছে। কখনও ছুটন্ত মানুষের পায়ের শব্দে ফিসফাস কথায় হাসিতে মধ্যরাত্রি চমকে চমকে উঠছে। কখনও তীক্ষ্ণ শব্দে সিটি বেজে উঠছে।

আর একটু ওপাশ থেকে ভয়ার্ত মানুষের সাড়া উঠছে।

সুধাংশুবাবু ভাবছিলেন—মেয়েটি ঠিকই বলেছিল। বেয়ে হয়ে পড়লে বিপদ ঘটতে পারত।

রাত্রি তখন দুটো বাজতে পনের মিনিট—তখন গলিপথটা নীরব নিস্তব্ধ হয়ে এসেছিল, স্পষ্ট মনে হয়েছিল, এবার আক্রমণকারী আক্রান্ত হিংসা ক্রোধ ভয় আতঙ্ক সব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর নিজের ডায়রীতে স্মরণীয় দিনের স্মরণীয় ঘটনা লিখে রাখেন। তিনি ঠিক এই কথাগুলিই লিখে রেখেছেন—আক্রমণকারী আক্রান্ত দু'দলই ক্লান্ত হয়েছে—হিংসা ক্রোধ তার সঙ্গে ভয় আতঙ্ক সব যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন এক আশ্চর্য ঘুম আসে। সে ঘুমের তুলনা ঈশ্বরের করুণার সঙ্গে।

এইবার তিনি উঠবেন ঠিক করেছিলেন।

তাকিয়েছিলেন ওদের দিকে। মেয়েটির মা ঘুমুচ্ছে মেঝের উপর শুয়ে। বিছানাটা খালিই পড়ে আছে। মেয়েটি ঘুমুচ্ছিল বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। লণ্ঠনের আলো পড়েছিল তার মুখের উপর। মাথাটি ঈষৎ হেলে পড়েছিল পিছনদিকে। মেয়েটির সত্যই একটা মোহ আছে।

কপালে দু'পাশে ঢলকো করে নামিয়ে পিছনে একটি এলো খোঁপা। পরনে ফিতেপাড় শাড়ি গায়ে সাদা ব্লাউজ। বোজা চোখে কাজলের রেখার আভাস। গলায় বিছেহার কানে টাপ হাতে চারগাছা করে চুড়ি। শুধু জেগে ছিল সেই ছেলেটা। কাঁদুনে ছেলেটা আর কাঁদছিল না। তার ঘুমন্ত মায়ের কোলে বসে আপনমনে লণ্ঠনের আলোতে খেলা করছিল।

সেই মেয়েই আজ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

১৯৪৮ সাল—আর ১৯৬০ সাল।

আজও দেখলেন সেই আভরণগুলি। কিন্তু বেশভূষার মধ্যে আজ আর প্রসাধন নাই পারিপাট্যও নাই তবে অভ্যস্ত ছাঁদ ছাড়ে নি তার বেশভূষা। চোখের পাতায় আজ আর কাজল নেই কিন্তু কোলে কোলে মর্মান্তিক শোকের অসহনীয় দাহ বা হাহাকারের একটা কালো আভাস জেগে উঠেছে।

সুধাংশুবাবু তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিন্তু তাঁর মন চলে গিয়েছিল সেই অতীত কালে—এখন থেকে চৌদ্দ বছর আগে। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মনের মধ্যে স্মৃতিস্মরণে সমস্ত ছবিগুলো পরের পর ভেসে গেল।

মেয়েটির সে রাত্রের ছবি আজও জলজল করছে।

বিধবা মেয়ের ওই প্রসাধন ওই পোশাক, ঘরের তক্তাপোশের তলায় মদের বোতল, সেই অন্ধকার এবং গোলমালের রাত্রেও জানালায় টোকা, তারপর সেই সব কথাবার্তা তার পরিচয়ের কোন একটু স্থানও গোপন রাখে নি। মেয়েটা পরিচয় দিতেও এতটুকু সংকোচ করে নি। পরবর্তীকালে সুধাংশুবাবু চাঁপাকে ভাল করে না হোক—তাই বা কেন মোটামুটি বেশ চেনাই চিনেছেন। হিসেব করে দেখলে বলতেই হবে যে, ওই যে প্রথম রাত্রির সেই চেনা বা দেখা তাই পরবর্তীকালে বেশী করে সত্য এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

না, পরের দিনই ওর আর একটা পরিচয় পেয়েছিলেন। এবং তাতেই সম্পূর্ণ হয়েছিল মেয়েটির পরিচয়।

পরের দিন সকালবেলা তিনি খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন—দেখছিলেন কাল রাত্রের হাওড়ার বস্তির ঘটনা সম্পর্কে কি রিপোর্ট বেরিয়েছে। শাক দিয়ে মাছ যেমন ঢাকা যায় না—মাছের চেহারা দেখা না গেলেও যেমন গন্ধে ধরা পড়ে তেমনিভাবেই একথা আজ প্রমাণিত যে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদের যে ফোড়ং দিয়ে সংবাদ-ব্যঞ্জন পরিবেশন করেন তা থেকে হিন্দুদের তেলকাঁটার গন্ধ ওঠে। একটু চেষ্টা করলেই কাঁটা বেরিয়ে পড়ে। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'র পুজোকে নামে সর্বজনীন করে তুললেও মিথ্যা এবং সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি থেকে মুক্তি এ জাত পায় নি। ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম বলে ভজন গাইলেও অন্তিম সময়ে গান্ধীজী হায় রাম বলেই বিলাপ করেছিলেন।

সন্দেহটা তাঁর অমূলকও ছিল না। কাগজে সম্পন্ন মুসলমান ভদ্রলোকটির উপরেই প্রথম দোষ চাপানো হয়েছে। তিনি গুলি চালিয়েছিলেন এই খবরটাকেই বড় করে ধরে সুকৌশলে এই ধারণাই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, গুলি চালানোই হল গতকালের বস্তি আক্রমণের প্রথম হেতু। এবং একমাত্র হেতু।

বিশেষ কিছু করতে হয় নি; শুধু মোটা হেডলাইনে ঘোষণা করেছেন—'সাম্প্রদায়িক কলহে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার।' 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনৈক ধনী কর্তৃক চৌদ্দ রাউণ্ড গুলি ব্যবহার।' তারপর দেওয়া হয়েছে—'দলবদ্ধভাবে উত্তেজিত অপরপক্ষ কর্তৃক বস্তির উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ। গৃহে অগ্নিসংযোগ। সমস্ত বস্তিটি ভস্মীভূত।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে কাগজখানার ওই ছাপা লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং গত রাত্রের সেই ভয়াবহতা স্মরণ করছিলেন। হঠাৎ নজরে পড়েছিল বাড়ির সামনের রাস্তাটা ধরে একটি মেয়ে চলে গেল। একটি গলিপথ ধরে মেয়েটি রাস্তার উপর পড়ল এবং হাত তিরিশেক সোজা হেঁটে গিয়ে ওপারের একটা গলিপথে ঢুকে গেল।

পরনে ফিতেপাড় শাড়ি—সায়া ব্লাউজও আছে কিন্তু তা সাধারণ—তাতে কোন ফ্যাশন নেই; পিঠের উপর পড়ে আছে ভিজে একপিঠ চুল; তাতে চিরুনি দেওয়া হয় নি, চুলগুলি এখনও ভিজে; মেয়েটি সদ্য স্নান করেছে। পাশ থেকে মনে হল চিরুনি দেওয়া না হলেও কেশ-বিন্যাসের একটি ছাঁদ অনেক দিনের পাট ও ইস্ত্রি করা জামার হাতা বা পেণ্টালুনের পায়ার দাগের বা ভাঁজের মত কায়েম হয়ে গেছে। বুকখানা ধ্বক করে উঠেছিল তাঁর।

এই তো সেই মেয়ে। সেই কালকের রাত্রের মেয়ে।

চঞ্চল হয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কাগজখানা ফেলে দিতে দিতেই কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

এ কি করছেন তিনি! মেয়েটি ততক্ষণে উত্তরমুখে ওপারে গিয়ে পশ্চিমদিকের একটা ছোট রাস্তার মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ, বোধ করি মিনিট তিনেক পর তিনি নিজেকে আর সংবরণ করতে পারেন নি—

দ্রুতপায়ে পথের উপর নেমে এসে, এগিয়ে গিয়ে, যে-রাস্তায় মেয়েটি মোড় ফিরেছে সেই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু আর দেখতে পান নি। পশ্চিমমুখো রাস্তাটা প্রায় গজ পঞ্চাশেক গিয়ে একটা বাঁক বেঁকেছে—ততদূর পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তার আর কোন সন্ধান মেলে নি। রাস্তায় তখনও খুব লোকজনের সময় নয় এবং ওদিকটা একটু নির্জনও বটে। দুই রাস্তার মোড়ের উপর যে-বাড়িটা সেটা বর্ধিষ্ণু ধনীজনের বাড়ি, বাড়ির গেটে পাহারা আছে—গুর্খা দারোয়ান আছে—পালা করে পাহারা দেয়। সেই ফটকটার সামনে কলরব করছিল দাঙ্গায় বস্তি থেকে উচ্ছেদ হওয়া একদল মানুষ। অবশ্যই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক। এই ভোর-বেলা থেকে হতভাগ্যেরা ক্ষুধা অনুভব করছে। ছেলেগুলো কাঁদছে চেঁচাচ্ছে—বয়স্কেরা কাতর-ভাবে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে—মধ্যে মধ্যে হাঁকছে—বাবু! বাবু! বাবু মশা—য়!

আজও মনে পড়ছে দুটো কুকুর কয়েকটা কাক দুটো গরু এবং ময়লা টব মাথায় করে একজন জমাদারণী চলে যাচ্ছিল; এ ছাড়া আর লোক ছিল না রাস্তাটায়। রাস্তাটা ছোট রাস্তাই বটে। আগে এ রাস্তায় সবটাই বস্তি ছিল—এখন এই মোড়ের দিকটা ভেঙে খান দুই তিন বড় বাড়ি তৈরি হয়েছিল কিছুদিন আগে। পর পর দুখানা বাড়ির মালিকেরা যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে ওঠা বড়লোক।

এরই মধ্যে কোথায় যে গেল মেয়েটি, ভেবে পেলেন না তিনি। রাস্তার মোড় থেকে পর পর তিনখানা বড় বড় বাড়ি। তারপর রাস্তাটা আর রাস্তা নেই, একটা নোংরা গলিপথে পরিণত হয়েছে। তার দু'দিকেই বস্তি। এ সেই পুরনো কালের, বোধ করি মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে প্রতিষ্ঠা করা বস্তি। বস্তির ভিতরের রাস্তাটা বারো মাস কাদা হয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দুর্গমতম জায়গায় ইট পাতা। মাথার উপর সূর্য এলে তবে কিছুক্ষণের জন্যে রোদ্দুর নামে। এখানকার বাড়িগুলো বা ঘরগুলো বাড়িও নয় ঘরও নয়—ঝুপড়ির মত একটা অন্ধকূপ। মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে মেয়েরা, পুরুষদের মাথা নুইয়ে থাকতে হয়। এবং এই বস্তিতে যারা থাকে তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ। তাদের সঙ্গে তো এই মেয়ের কোন মিল নেই। এ বস্তিতে থাকে এদেশী ঘরামীর দল, কিছু রাত্রে-তার-কাটা ডাকাবুকো ছেলে, কিছু হিন্দুস্থানী মজুর আছে তারা মাটি কাটে, কিছু ওড়িয়া মজুর থাকে। একদিকের অংশটায় কিছু রাজমিস্ত্রী এবং মজুর-মজুরনী থাকত, তাদের এলাকার শেষে বিচিত্র সেই ইরানী বেদেরা এসে তাঁবু গেড়ে মধ্যে মধ্যে আড্ডা গাড়ত। এদের মধ্যে আরও আছে—খুনে গাঁটকাটা চোর, বে-আইনী গাঁজা আপিংয়ের কারবারী। এরা এখানকার পাকা বাসিন্দে নয় তবে একটা করে লুকোবার আড্ডা পেতে রেখেছে।

এই মেয়ের কাল রাত্রে যে-চেহারাই দেখে থাকুন সে-চেহারার সঙ্গে বস্তির বাসিন্দেদের কোন মিল নেই। ওই বস্তিতে সে গেল কোথায়? বিশেষ করে আশ্চর্য লাগল এই যে, মেয়েটি স্নান করেছে এই সকালে এবং একখানি পরিচ্ছন্ন ফিতেপাড় ধুতি পরে বেরিয়েছে। যার মধ্যে শুচি-শুদ্ধতার একটি আভাস আছে। ওই বস্তিতে যারা থাকে তারা থাকে—তাদের কথা আলাদা কিন্তু যারা থাকে না তারা ওই বস্তিতে ঢুকলে বেরিয়ে এসে স্নান না করে মনে মনে অশুচির

অশান্তি অনুভব করবে। স্নান করে ওই বস্তির মধ্যে ঢোকা অসম্ভব তাতে তার সন্দেহ নেই।

এ মেয়ে কালকের সেই মেয়ে কিনা তাই নিয়ে কৌতূহলের তাঁর অন্ত ছিল না। কেন যে সে কৌতূহল জেগেছিল সে প্রশ্ন সেদিন করেন নি—আজ কিন্তু না করে পারলেন না।

না, তা নয়। কোন আকর্ষণ ছিল না।

শুধু কৌতূহল। চকিতের মত মেয়েটির মুখের একপাশ দেখে তিনি চমকে উঠে বারান্দা থেকে নিচে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। ততক্ষণে মেয়েটি তাঁকে পিছনে ফেলে রেখে সামনে এগিয়ে গিয়ে চাটুজ্জেদের বাড়ি যে রাস্তায় সেই রাস্তায় মোড় নিয়েছে। তার পিছনটা দেখে মনে হয়েছিল, এ মেয়ে সেই মেয়ে। কাল রাত্রে আধো অন্ধকার ঘরখানা ও বারান্দার মধ্যে তাকে চলতে ফিরতে যতটুকু দেখেছেন তার সঙ্গে এ মেয়ের চলনের, পিছনদিকের আশ্চর্য মিল। তাই তাঁকে কৌতূহলী করেছিল সেদিন। রাস্তার উপর নামিয়ে এনেছিল। রোমান্স কিছু ছিল না। তবে এ কথা ঠিক যে গতরাত্রে যে-পরিচয়টি তার পেয়েছিলেন সে-পরিচয়টা না পেলেই ভাল হত। এবং কৌতূহলটা অহেতুকভাবে মাত্রা ছাড়িয়েছিল। আজও মনে রয়েছে তিনি ফিরে আসেন নি এগিয়েই গিয়েছিলেন। দু'পাশে তিনখানা বড় বাড়ি। সব থেকে বড় বাড়িটা পুরনো অনেক দিনের, তাদেরই বাড়ির সামনে খানিকটা জায়গা আছে, ফটক আছে, ফটকে দারোয়ান আছে। বাড়ির সামনে ভিখিরীর দল দাঁড়িয়ে আছে। বিপরীত দিকে পাকা বাড়ি দুখানা এবং অপেক্ষাকৃত নতুন। ওই বস্তি ভেঙেই এ দুখানা তৈরী হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। এরা একই বংশের তিন শরিক। লোহালক্কড়ের ব্যবসা আছে কারখানা আছে। বস্তি আছে। নতুন বাড়ির মালিক যারা তারা অল্প অংশের শরিক কিন্তু তারা মডার্ন—যুদ্ধের সময় কণ্ট্রাক্টারী করে নতুন ভাগ্য তৈরী করেছে।

বেশী দূর না, অল্প খানিকটা যেতেই হঠাৎ তাঁর ঠিক সামনেই ওই দুখানা বাড়ির দ্বিতীয় বাড়িটার দরজা খুলে মেয়েটি বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল দাওয়া বারান্দার উপর। মেয়েটি বোধ হয় প্রত্যাশা করে নি যে, তিনি এতদূর এগিয়ে তাকে দেখতে আসবেন। সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্রীমতী মেয়ে। তখন বয়স বোধ হয় বাইশ-তেইশের বেশী ছিল না। পূর্ণ যৌবন তখন। কিন্তু সর্বাঙ্গে অপুষ্টির শীর্ণতা ছিল। কিন্তু মুখে একটি সকরুণ কিছুর আবেদন ছিল। নারী পুরুষকে যে লাবণ্য দিয়ে আকর্ষণ করে সে লাবণ্যকে আরও যেন বেশী মিষ্ট করে তুলেছিল।

মনে পড়ছে আগের দিন রাত্রের তার যে কেশবিন্যাস, তার যে ছন্দ সে তার স্নান করা এলো চুলের মধ্যেও জড়িয়ে এবং ছড়িয়ে ছিল। শুধু চুলে কেন, তার স্নান করা তেল-চকচকে কপালে, তার চোখের কোলেও কি কিছু ছিল না যাকে গতরাত্রের পরিচয়ের আভাস বলা চলে? ছিল, কিন্তু তাকে আজকের মত প্রেতিনীর পরিচয় বলে ধরে নেওয়া যেত না। মেয়েটির মুখ সেদিন মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যাকে বলে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে। তার ভাঁজকরা বাঁ হাতের চেটোর উপর একটা পিতলের থালায় কিছু ছিল। আধমিনিটখানেক লেগেছিল তার আত্মসংবরণ করতে। তারপরেই তার মুখখানা

লাল হয়ে উঠেছিল। শ্যামবর্ণ মেয়ে—মাধবীর টকটকে কচি পাতার মত হয়ে উঠেছিল মুখখানার রঙ। চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের থালাখানাকে নামিয়ে কতকগুলো বাসী ফুল আর বেলপাতা একখানা শালপাতায় মুড়ে বাড়িখানার দক্ষিণে বস্তির পাশ দিয়ে গরু দুটোর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছন ফিরে গিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। একসঙ্গে ছুটে এসেছিল গরু দুটো—ওদিক থেকে কুকুরটা এবং পথের কাক কয়েকটাও লাফ মেরে মেরে এগিয়ে এসেছিল।

এর পর ব্যাপারটা এবং মেয়েটির পরিচয় আর খুব অস্পষ্ট মনে হয় নি। মেয়েটি এ বাড়ির নয়—এ বাড়ির মেয়ে ওই ভাঙা একতলা বাড়িতে নিশ্চয় যাবে না, যাবার কথা নয়। ওইটেই হয়তো ওর বাড়ি। এ বাড়িতে সকালে এসেছে কাজ করতে। এ বাড়ির পূজোর বাসী ফুল ফেলা বোধ করি ওর প্রথম কাজ। পূজোর বাসী ফুল তাতে ভুল নেই, নইলে ফুলের মধ্যে জবা থাকত না এবং তার সঙ্গে বেলপাতা থাকত না।

হায় দেবতা, তোমার ভাগ্য! এবং তোমার শুচিতার কপাল!

ফিরে এসেছিলেন তিনি সেদিন। প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েই ফিরে এসেছিলেন। তবুও সুনিশ্চিত হতে লেগেছিল আরও কিছুদিন। কারণ সেদিন রাত্রে তার সেই আচরণ—যে-আচরণ অন্ততঃ সে তাঁর সঙ্গে করেছিল তার মধ্যে তো কোন গ্লানি ছিল না। তিনি তাকে বিপন্ন হয়ে আশ্রয় চেয়েছিলেন—সেও তাঁকে সেই আশ্রয়ই দিয়েছিল। কোন সংকীর্ণতা তার মধ্যে ছিল না। এবং সারাটা ক্ষণ—সে তো কম সময় নয়—রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে প্রায় দুটো পর্যন্ত সাড়ে তিন ঘণ্টা। এর মধ্যে সে তাঁর দিকে কি একবারও অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল?—না। এবং পরের দিন সকালে ওই দাওয়ায় দাড়িয়ে তার ওই যে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়ার সবিনয় অপরাধ স্বীকৃতিকেও তিনি তো অপবিত্র অশুচি বলে মানতে পারেন নি। তিনি জানতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরের দিন সকালে আর মেয়েটিকে দেখতে পান নি। তিনি সকালে উঠে খবরের কাগজ হাতে তাঁদের বাড়ির বারান্দায় বসে রাস্তার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন—কিন্তু সে আসে নি। দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন পর বুঝতে পেরেছিলেন সে যায় না—তার বদলে যায় একটি আধবয়সী বিধবা মেয়ে। একটু লম্বাটে মাথায়, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে ব্লাউজ সায়া নয় শুধু শেমিজ; শেমিজের উপর আধ-ময়লা থান-কাপড় পরে মেয়েটি ঠিক ওই সময়েই তাঁর সামনে দিয়ে গিয়ে ওই রাস্তায় ঢোকে। চতুর্থ দিন সুধাংশুবাবু তাকে অনুসরণ করেছিলেন। এবং দেখেছিলেন এ মেয়েটিও ঠিক সেই বাড়িতে ঢুকে সর্বপ্রথম পূজোর থালা হাতে বাসী ফুল বেলপাতা ওই সেই গরু দুটোর মুখে দিয়ে খালি থালা হাতে বাড়ি ঢুকেছিল গিয়ে। চিনতে বাকী থাকে নি এ বিধবা তারই মা। তার সঙ্গে আরও একটা ছোট সত্য তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল যে, ওই গরু দুটো ওই ভোরে এসে ওই ফুল বেলপাতাগুলোর লোভেই এই বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

দিন পনের পরে আবার একদিন সকালে দেখেছিলেন মেয়েটিকে। সেদিন আর তিনি উৎসুক হন নি। একবার মুখ তুলে দেখে আবার মুখ নামাতে চেষ্টা করেছিলেন খবরের কাগজের

উপর। কিন্তু তাও পারেন নি। বসে থেকেই আবার চোখ তুলে দেখতে চেয়েছিলেন সেই মেয়ে কিনা এবং সে গলির ভিতর মোড় ফিরল কিনা।

বিস্মিত হয়েছিলেন। মেয়েটি মোড়ে মোড় ফিরতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল তার তাঁরই উপর।

তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

এরপর পর পর দিন তিন-চার এসেছিল মেয়েটি। রবিবার পড়েছিল একদিন—অর্থাৎ কোর্ট ছিল না। সেদিন প্রায় বেলা বারোটার সময় মেয়েটিকে ফিরে যেতেও দেখেছিলেন। যাবার সময় মেয়েটির দৃষ্টিতে সতর্কতার প্রচ্ছন্ন আড়ালে যৌবনের আহ্বান উঠেছিল যেন। বাঁকা চাউনির মধ্যে যেমন সে দেখছিল কে তাকে অনুসরণ করছে—কে তার গা ঘেঁষে চলতে চেষ্টা করছে, তেমনি ছিল ঠোঁটের কোণে ক্ষুরের ধারের মত হাসি। সেই রবিবার দিন বেলা চারটের সময় আবার এসেছিল ও একবার। এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে গিয়েছিল।

আরও কিছুদিন পর পূর্ণ পরিচয় মিলেছিল।

বোধ হয় আরো মাস ছয়েক পর। একদিন ওই লম্বামাথায় বিধবাটি, সেদিন রবিবার, সেই সকালেই এসে তাঁর বারান্দার উপর উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ঘোমটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল —বাবু!

একান্ত অপরিচিতের মত তিনি বলেছিলেন—কি চাই?

হাত জোড় করে মেয়েটি বলেছিল—আমরা বড় গরীব বাবা। আমার এই কাগজটি যদি দয়া করে দেখে দেন। আপনি উকীল।

বিধবার মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাংশুবাবুর মায়া হয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুপকারের একটি সুযোগ পেয়েও তিনি খুশী হয়েছিলেন। হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে দেখেছিলেন। হাওড়া মুনসেফী আদালতের একখানা সমন। তার সঙ্গে খান পাঁচ-ছয় কাগজ জুড়ে একটা নালিশের আর্জির নকল।

কোন এক মৃত প্রণবকুমার চক্রবর্তীর ওয়ারিশন নাবালক পুত্র স্বপনকুমার ও তস্য অভিভাবিকা মাতা মৃত প্রণবকুমারের বিধবা পত্নী রত্নমালা দেবীর উপর পাঁচশো কয়েক টাকা কয়েক আনা হ্যাণ্ডনোট দরুন পাওনা বাবদ নালিশ করেছেন কোন এক বি. এন. মালিক—ম্যানেজিং ডিরেকটর, বি. এন. মালিক অ্যাণ্ড কোং।

—কে? এই রত্নমালা কার নাম?

—আমার সেই হতভাগা মেয়ের নাম বাবু।

—কার?

—চাঁপার। তাকে দেখেছেন আপনি। অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে কথা ক'টি।—স্বপন ওর সেই ছেলেটা। ডাকনাম নীলু।

মনে পড়েছিল ডেয়ো পিঁপড়ের কামড়ে বিক্ষত সেই কান্নায় পৃথিবী মাথায় করা হাড়জিরজিরে ছেলেটার কথা।

হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন—তোমাদের নেবে কি? বাড়িটা কি তোমাদের? মানে প্রণবকুমারের?

—বাড়িটা আমার স্বামীর ছিল বাবা—তা সেও তো বাঁধা দেওয়া আছে। প্রণবকুমারের নয়। প্রণবের কিছু ছিল না বাবা, কিছু রেখে যায় নি।

ইতিমধ্যে মক্কেল এসে পড়েছিল। সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—দেখ এখন তো আমার সময় হবে না। আর মামলার দিনও এখন দূরে। অন্য এক সময় আসতে হবে। বুঝেছ—

বিধবা বলেছিল—আমরা বড় গরীব বড় অসহায় বাবা—দয়া করে যদি কমসম নিয়ে—

সুধাংশুবাবু কথায় বাধা দিয়ে বলেছিলেন—দেখ সেদিন তোমরা আমার উপকার করেছ। সত্যিই উপকার করেছ—

—না না বাবা—

—থাম। যা বলছি, শোন। আমি নিজে তো দেওয়ানী মামলা করি নে। আমি সব শুনব—শুনে যদি সামান্য ব্যাপার হয় তবে আমিই করে দেব। নেব না আমি কিছু। বুঝেছ। তবে জটপাকানো কেস হলে যাতে অল্প খরচে হয় সেইভাবে ব্যবস্থা করে দেব। তুমি সন্ধ্যেবেলা এস। ঠিক সন্ধ্যের মুখে।

উপকারের কিছু প্রত্যুপকার করতে চেয়েছিলেন সুধাংশুবাবু। সেদিনের রাত্রের সে উপকার তো অস্বীকার করা যায় না। সেদিন রাত্রে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে তিনজন মাথায় লাঠির আঘাত পেয়েছিল। একজন ছুরি খেয়েছিল হাতে। তাঁদের দলের সেই ছোট ছেলেটি যে প্রথম বোমা ছুঁড়েছিল সে নিজের বোমার লোহার টুকরোয় আহত হয়েছিল—তার উপর কেউ তার হাতখানা দুমড়ে ভেঙে দিয়েছিল—তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। তিনি এবং আর দুজন ফিরেছিলেন আহত না হয়ে, কোন আঘাত না খেয়ে।

এ ছাড়াও পরের দিন থেকে বিপক্ষপক্ষ, যাদের মধ্যে ধর্মান্ধ কুশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ বেশী, সেই সব মানুষদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর বাড়ির সামনে অনেক বোমা বা পটকা ফেটেছে; দেওয়ালে অনেক কুশ্রী বিশ্রী স্লোগান লেখা হয়েছে; ভয়ও অনেক দেখানো হয়েছে। রাস্তার লোকে মধ্যে মধ্যে টিটকারিও কেটেছে। তার জের আজ এই আট ন মাসেও শেষ হয় নি। হয়তো বা আবার কোনদিন রাজনৈতিক কৌশলে বা প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতার আগুন আবার জ্বলবে—এবং সেদিন আবার তাঁর বাড়ির সামনে তাণ্ডবের পুনরাবৃত্তি হবে। এবং এখনও এদেশে অনেক মুসলমান আছে—এমন কি ওই বস্তিটার খানিকটা অংশেও এখনও আছে, সেখানেই আবার আক্রমণ শুরু হবে। এর মধ্যেও তিনি ওই মেয়ে দুটির উপরকারকে এতটুকু খর্ব করে দেখতে পারেন নি। এদের সম্পূর্ণ ভিতরটা সেদিন তিনি দেখে এসেছেন এবং বাইরেটাও দেখছেন পরের দিন থেকে—এরা ভিতরেও কালো এবং বাইরেও এরা মলিন এবং ভীরু। এদেরকে নীতিগতভাবে স্নেহ কোনমতে হয়তো করা যায় না—কিন্তু এরা বড় দরিদ্র। শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্যই নয়, কোথায় যেন একটা মনুষ্যত্বের দারিদ্র্যেও এরা বড় দরিদ্র।

সেই কারণেই মমতা হয়েছিল এবং প্রত্যুপকারও করতে চেয়েছিলেন সুধাংশুবাবু। সে-সময় সে চলে গিয়েছিল এবং কথামত সন্ধ্যেবেলা আবার এসেছিল। এবার একলা আসে নি। সঙ্গে এসেছিল ওই মেয়ে। এবং সেদিনের সেই কাঁদুনে ঘ্যানঘেনে ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে এসেছিল। কোলে থেকেও সে কাঁদছিল। সেই খুনখুনে কান্না। এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা। এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা!—এঁ্যা—!

নিরন্তর একটা অভিযোগ যেন শূন্যমণ্ডলে বাতাসের প্রবাহের মত বয়ে চলেছে ওর জীবনে। আপিসঘরের একদিকে তখনও পর্যন্ত একখানা পুরনো কালের তক্তাপোশ পাতা ছিল, আর টেবিলের সামনে ছিল খানকয়েক চেয়ার। সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—বসো।

তারা ইতস্ততঃ করে ভাবছিল কোথায় বসবে।

সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—চেয়ারে বসো।

—না, আমরা এই মেঝের উপর বসি। বলেছিল মা।

—না না। ওই তক্তাপোশে বসো তাহলে। হ্যাঁ বসো।

মেয়েটি বসেছিল। মা বসে নি। সে মেয়ের সেই রুগ্‌ণ ছেলেটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল। মেয়ে মাকে বলেছিল—বস্। উনি বলছেন তো বসতে। আমরা তো ছোটলোক নই।

মা এবার মেয়েকে সামনে করে তার পিছনে বসেছিল। আপিসঘরে একশো ওয়াটের বাল্‌ব জ্বলছিল। তার আলো পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল মেয়েটির উপর।

আজও সেই মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। পিছনে তার বর্ষাকালের কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার; সামনের রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো আজ জ্বলছে না। জ্বলে না আজকাল—হয় বাল্‌ব যায়, নয় তার যায়, নয় আলোর সুইচ অন করার দায়িত্ব যাদের তারা জ্বালে না।

চাঁপা ওরফে রত্নমালা। বারো বছর পর তাঁর সামনে তাঁরই বসবার ঘরের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আজ নিওন জ্বলছে। নিওনের স্বপ্নালু আলোর ছটায় ওই অন্ধকার পটভূমির সামনে ওকে আজ প্রেতিনী মনে হচ্ছে। বারো বছর পর আজ ওর বয়স চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ। পূর্ণ যৌবন ওর সারা অঙ্গে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মফুলের মত দেখতে ও নয়—সে রূপ ওর নেই—তবে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে পদ্ম যেমন প্রস্ফুটিত অবস্থায় বেশ কিছু-দিন থাকে ওর লাবণ্য-যৌবনও তাই—যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু সারা অঙ্গে সেই যৌবনরূপের ছন্দের মধ্যে এমন বিন্যাস আছে যা পুরুষচিত্তকে প্রলুব্ধ করে; কিন্তু লোভকে যে সংযত করতে পারে তার কাছে মনে হয় অশ্লীল। নারী যখন সারা অঙ্গে নিমন্ত্রণের সজ্জা চাপায় তখন তাকে নির্লজ্জা হতে হয়। এ মেয়ে অন্ততঃ আজ আঠারো বৎসর বিধবার আবরণের উপর দেহব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন বহন করে চলেছে। সেই বিজ্ঞাপন-বহন-করা যৌবনবতী চাঁপাকে প্রেতিনী ছাড়া কি মনে হবে তাঁর!

ওঃ!

সেদিনের সেই ক'টা কথা যেন স্তব্ধ পৃথিবীর কোন এক নিশীথ রাত্রে এক কালো ইস্পাতের তৈরী নারীমূর্তির কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, অর্থাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর বলে মনে হয় নি। সে

কথা ক'টা সুধাংশুবাবু আজও ভুলতে পারেন নি।—"বসুন জাত যাবে না।"

বারো বছর আগে সেই সেদিন রাত্রে।

মনে পড়েছে মেয়েটিই এগিয়ে এসে তাঁর টেবিলের উপর আদালতের সমন আর্জির নকল এবং তার সঙ্গে দশটাকার একখানি নোট নামিয়ে দিয়েছিল।

দশটাকার নোটখানা আঙুল দিয়ে ঠেলে দিয়ে তিনি বলেছিলেন—ওটা রাখো।

মেয়েটি নম্রকণ্ঠে বলেছিল—আবারও দেব—

মাঝখানে বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন—না।

মেয়েটি বিপন্নের মতই নোটখানা হাতে করে নিয়ে টেবিল ধরে দাঁড়িয়েছিল।

সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—তক্তাপোশে গিয়ে বসো। হ্যাঁ, তারপর বলো তো বিবরণ! তোমার স্বামীর নাম ৺প্রণবকুমার চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ।

—তিনি টাকা ধার করেছিলেন—

হঠাৎ মেয়েটা লেজে পা-দেওয়া সাপের মত ঝাপটা মেরে পিছন ফিরে ছোবল দেবার ভঙ্গিতেই ওর বাচ্চা ছেলেটাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠ্যালা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল। এক মুহূর্তে কোথায় চলে গিয়েছিল তার বিনম্র মিষ্ট কণ্ঠস্বর, বিনীত কথার ভঙ্গি, রুক্ষতর আক্রোশভরা কণ্ঠস্বরে বলে উঠেছিল—দূর হ আপদ কোথাকার। সে কথাগুলো সত্যই অবিস্মরণীয়-রূপে নির্মম এবং নিষ্ঠুর। ছেলেটার অপরাধ—সে পিছনে দিদিমার কোল থেকে খুনখুন করতে করতে এগিয়ে এসে মায়ের পিঠ ধরে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো বা কাঁধের উপর ফেলা আঁচল ধরে আকর্ষণও করে থেকেছিল। মা সেটুকুও সহ্য করে নি—তাকে 'দূর হ আপদ' বলে সাপের ছোবলের মত ছোবল দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। ব্যাপারটার ওজন ঠিক কতখানি তা' বলা সহজ নয়। যা ঘটেছিল তা' না ঘটলে ঠিক এমনভাবে মনে দাগ কাটত না। বছর চারেক বয়সের রুগ্ন দুর্বল শিশু, মায়ের হাতের ঝাপটায় টলে পড়ে গেল এবং পড়ে গেল তক্তাপোশের উপর থেকে মেঝেতে। সঙ্গে সেই সেই-রাত্রের মত কঠিনতম প্রতিবাদ এবং তার সঙ্গে সম্ভবতঃ করুণতম অভিযোগ জানিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল সে।

দিদিমা প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে ছেলেটাকে কুড়িয়ে বুকে তুলে নিয়েছিল। সুধাংশুবাবু প্রায় আপনা-আপনি বলে উঠেছিলেন—আহ-হা। কিন্তু এই আশ্চর্য মা বলে উঠেছিল—মর মর মর। মরে যা তুই মরে যা!

মুহূর্তে বোমার মত ফেটে পড়েছিলেন সুধাংশুবাবু। এই নির্লজ্জা মেয়েটার এই নিষ্ঠুর হৃদয়-হীনতা তাঁর কাছে শুধু অসহ্যই মনে হয় নি—তার সমস্ত ক্রোধকে আকস্মিকভাবে একমুহূর্তে পুঞ্জীভূত করে একটা সংঘাতের উত্তাপে ফাটিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলে উঠেছিলেন—এ—ই নির্লজ্জ মেয়ে কোথাকার।

দিদিমা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠে চাপড়ে চাপড়ে আদর করে থামাতে চাচ্ছিল। ছেলেটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। এই চিৎকার-করা তিরস্কারে মেয়েটি চমকে উঠে বিবর্ণ পাংশুমুখে

তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল।

কিছুটা নিজেকে সংযত করে তিনি বলেছিলেন—এমনি করে তুমি ছেলেটাকে ফেলে দিলে?

ছেলেটা তখনও কাঁদছে তারস্বরে।

তিনি তাকে দোষ দেন নি। তার জীবনে বঞ্চনার আর শেষ নেই। এই মা বোধ হয় তাকে স্তন্যেও বঞ্চিত করে রেখেছে।

মেয়েটা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে তা স্বীকারও করলে।

সুধাংশুবাবুর কথা শুনে মেয়েটা এবার স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। তার স্থিরদৃষ্টির সম্মুখে সুধাংশুবাবুর একবিন্দু অস্বস্তি অনুভব করার কথা নয় এবং তার পক্ষেও এই অভিযোগের সম্মুখে এমনভাবে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাও সম্ভবপর বা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মেয়েটা বোধ করি অস্বাভাবিক। সে তাকিয়ে ছিল। যার জন্য সুধাংশুবাবু তাঁর অভিযোগকে আরও জোরালো করে তোলার প্রয়োজন অনুভব করে বলেছিলেন—সেদিন রাত্রেও আমি দেখেছি তুমি ওই শিশুটার প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কর—মর্মান্তিকভাবে অভিসম্পাত কর।

মেয়েটি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কঠিন অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—ও আমার পথের কাঁটা।

একটু থেমে বোধ করি ভেবে নিয়েই বললে—ও আপনি বুঝবেন না—ওই আমার বন্ধন। ও ছিঁড়লেই আমার মুক্তি। ওকে উপড়ে ফেলতে পারলেই আমার পথ পরিষ্কার।

এর আর উত্তর খুঁজে পান নি সুধাংশুবাবু। নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়িয়ে মাকে বলেছিল—নে উঠে আয়।

মা সকাতরে বেশ ভয়ের সঙ্গেই অনুরোধ করেছিল মেয়েকে—চাঁপা!

—না। উঠে আয়।

মা উত্তর দিতে পারে নি। মেয়ে বলেছিল—তবে তুই থাক আমি চললাম। বলে মায়ের বুক থেকে কান্নায় ভেঙে পড়া ছেলেটাকে কাঁধের উপর ফেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর দাঁড়ায় নি বা কোন একটা কথাও বলে নি।

মেয়েটির মা হাত জোড় করে বলেছিল—কিছু মনে করবেন না বাবা। আমার মেয়ে সম্পর্কে আমার বলবার মুখও নেই কথাও নেই। দিনরাত জ্বলছে বাবা, আগুনের মত জ্বলছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আক্রোশ। সব থেকে বেশি ওই ছেলেটার উপর। হতভাগা অদৃষ্ট—এক বছর বয়সে বাপ খেয়েছে। অবহেলার শেষ নেই। তবু—।

বাইরে থেকে ডাক এসেছিল—মা! দাঁড়িয়ে থাকব কত?

সুধাংশুবাবুই বলেছিলেন—আচ্ছা তুমি যাও। কোন দেওয়ানী উকীলের কাছে যেয়ো। সামান্য কেস বলেই মনে হচ্ছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

সকাতর দৃষ্টিতে মার্জনা ভিক্ষা করে নিয়ে মা চলে গিয়েছিল।

পরের দিন সকালবেলা আবার বিধবাটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে চলেছিল ওই চাটুজ্জেদের বাড়িতে। থমকে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেও একটুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তারপর চলে গিয়েছিল চাটুজ্জেদের বাড়ি। কথাবার্তা বলতে বোধ হয় ভরসা করে নি। সুধাংশুবাবুরও ইচ্ছে হয় নি।

দুই

এতবড় ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো মেয়েটিকে তাঁর মনে থাকত না। একটা আবরণ পরে ওকে আড়ালে ফেলে দিত। নিত্য যে সব লোক তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করে—অথচ তিনি তাদের চিনেও চেনেন না -তাদের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে যেত। কিন্তু ওর ওই দু'দিনের আচরণের মধ্যে এমন একটি ক্ষুব্ধ মনের উত্তাপ ছিল যার ছেঁকা লাগার স্মৃতিটুকু তিনি ভুলতে পারেন নি। তার উপর এই মা অথবা ওই মেয়ে দুজনের কেউ-না-কেউ নিত্য ভোরবেলা তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে স্নান সেরে শুচিশুদ্ধ হয়ে চাটুজ্জেদের বাড়ি কাজ করতে গিয়েছে। আজ আর মা নেই কিন্তু মেয়ে আজও যায়। পরনে শৌখিন সায়া ব্লাউজ পরিচ্ছন্ন ফিতেপাড় শাড়ি, ভিজে এলো চুলে বিগত রাত্রির একটি বিলাসছন্দের চিহ্ন তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে যায় বা মনে রাখিয়ে দেয়—ভুলতে দেয় না। আজ বারো বছর যাচ্ছে। ভোরবেলা যায়, ফেরে যখন তখন তিনি কোর্টে চলে যান, ছুটির দিন দেখেন এগারটায় ফেরে। এই বারো বছরে—হ্যাঁ বারো বছরই হল ; দাঙ্গার ঘটনাটা ১৯৪৮ সালে আর আজ হল ১৯৬০ সাল। এই বারো বছরে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। এবং ক্রমে ক্রমে মেয়েটার যে সব পরিচয় পেয়েছেন তাতে ওর এই প্রেতিনীত্ব সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হয়েই একটি কঠিন বিরূপতা পোষণ করে আসছেন। ওর সেদিন রাত্রে করা উপকারটুকু তাঁর গলায় কাঁটার মত বিঁধে আছে। এবং এরপর যে সব আচরণ দেখেছেন তাতে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। সেই ক্ষোভে এবং বিস্ময় বশতঃই ওকে জানতে চেয়েছিলেন। বিচিত্রভাবে জেনেও ছিলেন।

এক শিবেন ভট্টাচার্যের মেয়ে। শিবেন ভট্টাচার্যকে লোকে ভুলে গেছে। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা-করা, দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্ রয়েছে ; শুধু রযেছেই নয়, বিরাট একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে।

অল্পবয়সে অনেক টাকা হাতে পেয়েছিল শিবেন। পেয়ে একেবারেই মডান হয়ে উঠল। বাপ ছিলেন মোক্তার। কৃতী মোক্তার। তাঁর বাবা ছিলেন খাঁটি ভট্টাচার্য। গ্রাম থেকে হাওড়া শহরে এসে ওই পৌরোহিত্য করেই ভটচাজবাড়ির ভিত গেড়েছিলেন। দেশে জমিজেরাতও কিনেছিলেন।

শিবেন ভটচাজের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনের কাছেই জেনেছিলেন। নিত্যবাবু। ওই প্রথম ঘটনার বছর দেড় কি এক বছর আট ন মাস পর নিত্যবাবু এসে তাঁর প্রতিবেশী হয়েছিলেন। এবং সুধাংশুবাবু কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ না করলেও নিত্যবাবুই নিজে থেকে 'হায় হায়' করে মেয়েটি সম্পর্কে কোনদিন আক্ষেপ, কোনদিন বা কটুভাষায় বিক্ষোভ প্রকাশ করে, মেয়েটির বাপ ওই শিবেন ভট্টাচার্যের কথা বলে যেতেন। বলতেন—সইল না। বুয়েচেন না, সইল না। ভট্টচার্য বামুনের বংশ। একেবারে সেই ইতুসংক্রান্তির বামুনের ঘরের মত। বুয়েচেন না? নিত্যবাবুর মুদ্রাদোষ ছিল ওই 'বুয়েচেন না?' বুলিটি।

ইতুসংক্রান্তির ব্রতকথার দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পই বোধ হয় পুরনো বাংলাদেশের শতকরা

নিরানব্বুইজন ব্রাহ্মণের গল্প। এক ছিল ব্রাহ্মণ আর তার ব্রাহ্মণী—আর দুটি ছেলে কি গণ্ডা দুয়েক ছেলেমেয়ে।

এক ছিল রাজা আর তার সুয়ো দুয়ো দুই রানী—এ গল্প বোধ হয় এদেশের বামুনদের নয়। দু'দশ ঘর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল—তারা জমিদার-টমিদার ছিল। বামুনের কপাল খুলল ইংরেজ আমলে।

নিত্যবাবুর ব্যাখ্যা বড় ভাল ছিল।

বলতেন—লক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে—এক ছিল পরমধার্মিক ব্রাহ্মণ, মহাতেজস্বী, এও বাংলা-দেশের সচরাচর ব্রাহ্মণদের গল্প নয়। বুনো রামনাথ অবিশ্যি একটা-আধটাই হয়। বিদ্যেসাগর মশায়ের ঠাকুরদাদার মত গায়ের জোরওয়ালা রাগী মানুষও বেশী না। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণেরা সেকালে ছিল নিরীহ দরিদ্র। যজমান চরিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করত কোনরকমে। বৈশাখ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত মেয়েদের বারো মাসে তের ষষ্ঠী—সকল জনের জন্য স্নানযাত্রা রথযাত্রা থেকে দোলযাত্রা মেড়া-পোড়া ইঁদ-পূজো মনসা-পূজো দুর্গাপূজো কালীপূজো—জগদ্ধাত্রী থেকে নবান্নে অন্নপূর্ণা চৈত্রে বাসন্তীপূজো—তার সঙ্গে ঘরে ঘরে জন্ম-মৃত্যু নিয়ে দশকর্মের কাণ্ডকারখানা নিয়ে মোটমাট ভটচাজ পণ্ডিতদের যে আড়া এই চাষের দেশে পাতা ছিল তাতে রোজকারের মাছ যা ধরা পড়ত তা' কম নয়।

নিত্যবাবুর কথা মনে পড়ছে—বলেছিলেন—আড়া বোঝেন তো? আড়া হল বাঁশের শলার ঘের, মাঠের জলনিকাশী নালা জুড়ে পেতে মাছ ধরবার একরকম ব্যবস্থা।

নিত্যবাবু ব্যবসায়ে ছিলেন পাটের দালাল। শখে ছিলেন থিয়েটার এবং গান পাগল। তার সঙ্গে একটা নেশা জন্মেছিল—নাটক লেখার। নাটক লিখেও নাটক যখন অভিনীত হল না তখন তিনি প্রবন্ধ লেখা ধরেছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম কালে এদেশে যতগুলো বিদ্রোহ হয়েছিল তাই নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। ওই নাটকের সূত্র ধরেই নিত্যবাবুর সঙ্গে শিবেন ভটচাজের আলাপ হয়েছিল।

—বলি কি বলুন? বুয়েচেন না, কপাল ছাড়া কি বলব? শিবেনের মেয়ে! এ্যা! শিবেন বাপের টাকা পেয়ে 'দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্' খুললে। দধীচি নাম শুনেই বুঝতে পারছেন যে তার সঙ্গে বজ্রের সম্বন্ধ আছে। মানে বজ্র তৈরী হবে। মানে অস্ত্র। ১৯২৪-২৫ সাল। তখন স্বদেশীর উত্তাপে সারা দেশ তেতে উঠেছে। বোমার খোল তৈরী হবে। ছোরা তৈরী হবে। ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হবে। আর একটা টাটা তৈরী হবে। আর কল্পনা একটা থিয়েটার মানে স্টেজ প্রতিষ্ঠা করবে। তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ী থিয়েটারে নেমেছেন। এখন এমন একটা থিয়েটার গড়বে যেখানে শুধুই যাকে বলে আগুনের মত নাটক প্লে হবে। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ সেই জন্যেই। আমি মশাই বারণ করেছি কিন্তু শোনে নি। বলেছি—উন্মাদের মত খরচ করো না। সে বলত—নেভার মাইণ্ড। আমার ঠাকুরদা ছিল পূজুরী বামুন। বাবা হয়েছিলেন মোক্তার।

মেয়েটি সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঠোঁট দুটি যেন কাঁপছে।

চোখের দুই কোণে দু'ফোঁটা জল নিটোল হয়ে জমে উঠেছে এই মুহূর্তে।

হাত দুখানি জোড় করেছে।

নিত্যবাবুর কথা কানে বাজছে।—ভটচাজ বামুনের বংশ। সইল না।

তিনি নিত্যবাবু নন—ও কথাটা মানেন না। কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস বটে। তাকে অস্বীকারের পথ নেই।

প্রপিতামহ (মেয়েটির) পেশায় ছিলেন যজমানসেবী ব্রাহ্মণ। হাওড়া আমতা লাইনে গ্রামাঞ্চলে বাড়ি ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে হাওড়ায় এসেছিলেন বংশের শালগ্রাম শিলাটিকে নিয়ে। তাঁর দৌলতে সত্যনারায়ণ থেকে দশকর্ম পর্যন্ত যে ডেকেছে তার বাড়ি গিয়ে ক্রিয়াকর্ম করে হাওড়ায় একখণ্ড জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন। একতলা পাকা দালান একখানি—খাপরার চালের রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর তার সঙ্গে একখানা গোয়ালঘর পর্যন্ত করেছিলেন তিনি। তার সঙ্গে দেশেও ঘর করেছিলেন—জমি কিনেছিলেন। ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাস করিয়েছিলেন। মধুসূদন ভট্টাচার্যের ছেলে হরিহর ভট্টাচার্য এণ্ট্রান্স পাস করে হয়েছিলেন মোক্তার।

কৃতী মোক্তার হয়েছিলেন। ভাল ইংরিজী লিখতেন, প্রয়োজন হলে ইংরিজীতে সওয়াল জবাব করতে পারতেন। ফৌজদারী আইন খুব ভাল বুঝতেন। তার সঙ্গে ছিলেন হিসেবী লোক। এক টাকা উপার্জন করে আগে আট আনা একটা চাবিহারানো কাঠের বাক্সের ডালার ফুটো দিয়ে ফেলে জমিয়ে রাখতেন। হিসেব করে তিন ছেলের জন্যে তিনখানা বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন হাওড়া শহরে। তাও এক জায়গায় নয়, একখানা শালকেতে একখানা হাওড়ায় এবং তৃতীয়খানা শিবপুরে।

জায়গাজমি বাড়ি সব ঠিক ঠিক হিসেব মিলিয়ে করেছিলেন হরি মোক্তার। বোধ করি কল্পনাও করেছিলেন, ছেলেরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মোক্তারী বা ওকালতী অর্থাৎ আইন ব্যবসায় করবে। যার জন্যে প্রতিটি বাড়িকে দু'ভাগে ভাগ করে তৈরী করিয়েছিলেন, যার সামনের ভাগটা খানিকটা বাগান নিয়ে বৈঠকখানা বা আপিসবাড়ি হতে পারত অনায়াসে এবং তার পিছনের অংশটায় ছিল বসতবাড়ি। একতলা করে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন বলতেন —ছেলেরা দোতলা তুলবে। এসবের জন্য হরিহর ভটচাজ হরিত্ব এবং ভটচাজত্ব থেকে প্রমোশন পেয়ে হয়েছিল শুধু হরি মোক্তার। লোকে হরিহর ভটচাজ আর বলত না, বলত হরি মোক্তার। বড়ছেলেকে ল' পরীক্ষার ইণ্টারমিডিয়েট পাস করিয়েও গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর আর আয়ু ছিল না। সামান্য তুচ্ছ হেতু, জুতোর কাঁটা উঠে পায়ে ফুটে ছোট ক্ষতের সৃষ্টি করে, দিন তিন-চারের মধ্যে ধনুষ্টঙ্কারে মারা গিয়েছিলেন। অন্য দুটি ছেলের একটি তখন বার দুই বি-এ ফেল করেছে। ছোটটি আই-এ পড়ছে।

এই ছোট ছেলের নাম শিবেন।

এবং ছোট ছেলেরই মেয়ে রত্নমালা—ডাকনাম চাঁপা।

১৯২৪-২৫ সালে শিবেন পড়ত কলকাতার সিটি কলেজে। বাপ মারা যেতেই পড়া ছেড়ে বিষয়-সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিয়ে নিজের উন্নতি এবং দেশের উন্নতির জন্য ছোট একটা লোহার কারখানা খুলেছিল। দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্। বজ্রের খোল তৈরী হবে!

কল্পনা ছিল, একদা সে টাটানগরের মত এক শিবনগরের পত্তন করবে। ১৯২৪-২৫ সাল। গান্ধীজী এসেছেন—চিত্তরঞ্জন প্র্যাকটিস ছেড়ে সর্বত্যাগী দেশবন্ধু হয়েছেন। আজকের নেতাজী—সেদিনের বাংলাদেশের তরুণ নায়ক সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস চাকরি পেয়েও সে-চাকরি প্রত্যাখ্যান করে দেশবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়েছেন। কলেজের ছেলেরা তখন একদফা কলেজ বয়কটের পালা শেষ করে আবার নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে গিয়ে ঢুকছে। এই সময়ে পিতৃহীন শিবেন ভটচাজ বাপের শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন করে কলেজ ছেড়ে দিল এবং পত্তন করলে এক লোহার কারখানার। নামটা হয়েছিল জবর। দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্। কল্পনা ছিল বজ্র তৈরী করবে। কোথা দিয়ে কোন্ যোগাযোগে কার সঙ্গে শিবেনের নাকি বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তাদের জন্যে বোমার খোল তৈরী করবার গোপন অভিপ্রায় থেকেই এই নামটা মাথায় এসেছিল। কিন্তু সে থাক, সে কোনদিন হয় নি।

যে-চরিত্র ও যে-জীবন থেকে এমন কল্পনার উদ্ভব হয়, যে-ভাবনা যে-সংকল্প থাকলে মানুষ এমন স্বপ্ন দেখে এবং একে সম্ভবপর করে তোলে তা শিবেনের ছিল না।

শিবেন ছিল অতি সাধারণ আবেগসর্বস্ব সেকেলে বাঙ্গালীর ছেলে। দেশোদ্ধারের পাঠ বা ভাবনা সেকালে শিক্ষিতদের মধ্যে সকলজনই কিছু-না-কিছু গ্রহণ করত। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ-মঠ বন্দে মাতরম্ থেকে তখন শরৎচন্দ্রের আমল পর্যন্ত সাহিত্যে, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদ-বাবুর নাটকে, দৈনিক সংবাদপত্রে সর্বত্রই ছিল এর ছোঁয়াচ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্রোত ছিল মূল উৎস সে বোধ হয় না বললেও চলে, কিন্তু শিবেনের স্বদেশ ও স্বাধীনতাপ্রীতির মূল উৎস ছিল সেকালের থিয়েটার। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এমন কোন নাটক সেকালে অভিনীত হয় নি যা শিবেন দেখে নি। এবং সে-দেখা একবার হয়েই ক্ষান্ত হত না। দুবার তিনবার, ক্ষেত্রবিশেষে একখানা নাটকের অভিনয় সে আট-দশবারও দেখেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দুখানা নাটক কলকাতায় খুব চলেছিল। একখানা মোগল পাঠান, একখানা দেবলাদেবী। ওই বই দুখানা দশবার করে দেখেছিল। তখন বাপের আমল—পড়ত ইস্কুলে, কোনরকমে বারো আনা হাতে এলেই চলে যেত থিয়েটারে। বসত আট আনার সীটে, খেতো আনা দুই তিনের, আর গঙ্গা পারাপারের দুটো পয়সা—ব্যাস। যাতায়াতের জন্য সে ট্রামে চড়ত না; বিডন স্ট্রীট থেকে গঙ্গার কোন ঘাটে এসে খেয়ানৌকায় এক পয়সা দিয়ে চলে যেত ওপারে।

শিশির ভাদুড়ী আসতেই মঞ্চে হল নবজীবন সঞ্চার। ওদিকে পিতৃবিয়োগ ঘটে শিবেন হল কাচা পয়সার মালিক। আই-এ পড়ে, বয়স আঠারো পার হয়েছে, সুতরাং নাবালক বলে কোন বাধানিষেধ আরোপ কেউ করে নি, করতে পারে নি। এবং তিন ভাই মিলেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নীতিটি সসম্ভ্রমে মেনেও নিয়েছিল তারা। বাপও ব্যবস্থাদি নানারকম করে গিয়েছিলেন—

বাড়ি নগদ টাকা উইলে লিখিতভাবে বণ্টন করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

বাপের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি চুকে যাওয়ার পাঁচ-ছ দিন পর পড়েছিল প্রথম শনিবার, সেদিন সে জনতিনেক বন্ধু নিয়ে দু'টাকার সীটের টিকিট কেটে শিশিরবাবুর আলমগীর নাটক দেখে এসেছিল।

আলমগীর নাটকখানি বোধ হয় দশবারেরও বেশীবার দেখা। আলমগীরবেশী শিশিরকুমারের প্রথম প্রবেশ, সেই ঈষৎ কুঁজো হয়ে বাঁ হাতখানা পিঠের উপর রেখে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে "মন্দ কি! দাম্ভিকা কাশ্মীরী বাঈয়ের দম্ভটা চূর্ণ করে দেওয়া যাক না" থেকে শেষ বক্তৃতা—"হে কবি, বছর যাক যুগ যাক, বহু শতাব্দী চলে যাক,—শতাব্দীর পারে একদিন তোমার তুলিকামুখে আলমগীরের এই মিলন-অভিলাষ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হোক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে এই চিরজাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর (ভীমসিংহের) সম্মুখে এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।" পর্যন্ত বহু স্থান সে সুর স্বর নকল করে মুখস্থ বলে যেতো। সীতা নাটক তার আগাগোড়া কণ্ঠস্থ ছিল। যখন তখন সে বলে উঠত—কার কার কার করে কণ্ঠস্বরে!—

ডি এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্তে'র—কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকস!—এই প্রথম দৃশ্যটা গোটাই সে একলাই বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন স্বরে অভিনয় করতে পারত।

কণ্ঠস্বর কর্কশই ছিল তবু স্বদেশী গান সে খুব ফিলিংস্ দিয়ে গাইত। কণ্ঠস্বর কর্কশ হলেও সুরে তার দখল ছিল। সুর ঠিক রেখেই গাইত। তার দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্-এর উদ্বোধনের দিনে সে একটা অনুষ্ঠান করেছিল—হাওড়া শহরেরই বিশিষ্ট নাগরিক, বড একটি কারখানার মালিক এবং আরও কয়েকটি ব্যবসার অংশীদার রায়বাহাদুরকে এনে অনুষ্ঠানটির পৌরোহিত্য করিয়েছিল—সে অনুষ্ঠানে সে কটি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নিজে উদ্বোধন সংগীত গেয়েছিল।

বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ—

... ...

আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য

মানুষ আমরা, নহি তো মেষ!

সেদিন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়েছিল রীতিমত হোমযজ্ঞ যথাবিধি শেষ করে তবে। সে হোমযজ্ঞ করেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত পরমনিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শেখর স্মৃতিরত্ন মশায়। রায়বাহাদুর মস্ত একটি বক্তৃতা লিখে এনেছিলেন। তাতে তিনি কলকারখানার কি আশ্চর্য অভ্যুদয় ইউরোপ আমেরিকায় এবং তার তুলনায় কি দৈন্য আমাদের তার বিবরণ ছিল।

নিত্যবাবু বলেছিলেন রায়বাহাদুর তাঁর ভাষণে নাকি প্রত্যাশা করেছিলেন যে হাওড়ার এই তরুণ যুবকটি এককালে এই দধীচি আয়রন ওয়ার্কস থেকে বজ্রের মত মজবুত এবং শক্তিশালী যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করবে—সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ বৃদ্ধি করে সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে।

সবশেষে বলেছিলেন—"শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।"

রায়বাহাদুর ছিলেন ওই চাটুজ্জেবাড়িরই বড়কর্তা।

সন্ধ্যায় ছিল খাওয়াদাওয়া। বন্ধুদের খাইয়েছিল—তার সঙ্গে আত্মীয়স্বজনেরাও ছিল। রাত্রি একটু গাঢ় মানে নটা নাগাদ একটু গানবাজনার আসর বসিয়েছিল শিবেন। গান সেকালের মডার্ন গান। তার মধ্যে স্বদেশী সংগীত ছিল না। রবীন্দ্রসংগীতও তখন সাধারণ জীবনে আসন পাতে নি। আজকালকার মত সাধারণ ঘরের মেয়েরা তখন গান শেখে নি; শিখলেও আসরে গাইবার কথা কল্পনা করতে পারত না।

এসব বিবরণ তাঁকে বলেছিলেন তাঁর বাড়ির সামনের প্রতিবেশী বর্তমানে মৃত নিত্যরঞ্জনবাবু। প্রতিবেশী তিনি ছিলেন না—নতুন করে হয়েছিলেন দশ বছর আগে। নিত্যরঞ্জনবাবু সেদিনের দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্ ওপনিং আসরে উপস্থিত জনেদের মধ্যে একজন। এসব কথাগুলি সেই নিত্যবাবুই বলেছিলেন সুধাংশুবাবুকে। বলেছিলেন—আজ থেকে অর্থাৎ ১৯৬০ সাল থেকে বারো বছর আগে ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে। মনে পড়তে বলেছিলেন—আরে তখন আপনার এই একাল তো না। তখন এখানকার এই সুনীতি মিত্তির সুচরিতা সরকার-টরকার কোথায় মশায়? তখন আপনার ইন্দুবালা আঙুরবালা দাসীদের আমল। কাজী সাহেব তখন খুব পপুলার। একেবারে মাতিয়ে ভাসিয়ে দেয়। "কে বিদেশী মন উদাসী" গানখানা কি গাওয়াই না গেয়েছিল মশাই সেদিন। বুঝেচেন না? কি বলব আপনাকে—মানে হাতের তালি আর ঘাড় নাড়ায় যাকে বলে মাতন তাই লেগে গেসল। অবশ্য 'রঙ' ছিল। মানে কিছু ড্রিংকের ব্যবস্থা ছিল। ভাল ড্রিংক। ছোট ঘরের বস্তু না। অভিজাত দ্রব্য। আর যে মেয়েটা সেদিন গাইতে এসেছিল তার গলাও ছিল আর দেখতেশুনতেও মেয়েটি ভাল ছিল।

একটু থেমে একটু একটু হেসে নিয়ে বলেছিলেন—শিবেনের চোখ ছিল। কানও ছিল। নিজে বাজাতে পারত ভাল। সেদিন আসর পাতলা হয়ে এলে বাঁয়া তবলা নিজেই টেনে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করেছিল। তখন লীলা, মানে সেই মেয়েটি আর কি, সে গান ধরেছিল বেঁকিয়ে। বেঁকিয়ে বোঝেন তো? বাজনদারের সঙ্গে তালের পাল্লায় আড়ি দিয়ে। অর্থাৎ ঠকাবার মতলব আর কি! রসের পাল্লা। মেয়েটার সঙ্গে শিবেনের তখন পরিচয়াদি হয়েছে। দু'চার রাত্রি ওর বাড়িও গিয়েছে এসেছে। পরিচয় ছিল। আসরে এসে শিবেনের কারখানার পত্তনটত্তন দেখে ওর প্রতি তার বেশ শ্রদ্ধাও হয়েছে। সুতরাং ভোজ-বাজির খেলায়, যাকে বলে সেই একদিনেই বীজ ফেটে অঙ্কুর থেকে ডালপালা-মেলা গাছ গজানোর মতো অনুরাগের ম্যাজিক বৃক্ষ তা বেশ ছত্রছায়া মেলে বড় হয়ে উঠেছিল। কল্পনা করেছিলেন শিবেনের কল্পনার থিয়েটারের বীজটিও একদা ঠিক এইভাবেই রাতারাতি রূপ নিয়ে একেবারে ফুলফোটা গাছ হয়ে গজিয়ে থাকবে। সকালে উঠে দরজা খুলেই দেখবেন বাড়ির সামনের দেওয়ালে তার নাটকের পোস্টার পড়েছে।

থিয়েটারটার নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

বসে বসে বিড়ি টানতে টানতে নিত্যবাবু বলেছিলেন—শিবেনের এই মেয়ে হল। এর নাম হল রত্নমালা; থিয়েটারের নামও রাখা হবে ঠিক হল রত্নমালা নাট্যালয়। নিত্যবাবু বলেছিলেন—ওর আদর কত ছিল! বিয়েতে টাকা খরচ করেছিল কত! দেখে দেখে পিতৃমাতৃহীন বুদ্ধিমান ব্রাইট ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিল। প্রণব চক্রবর্তী নাম ছিল। আমি সন্ধান দিয়েছিলাম। বিয়েতে আমি খেটেছি, পেটের উপর লুচির ধামা নিয়ে পরিবেশন করেছি। কোন আবদারের কথা বাবাকে বলতে না পারলে আমাকে ধরত। আজ সেই মেয়ে—। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন নিত্যবাবু। একটু চুপ করে থেকে খানিকটা উদাস হয়ে উঠে বলেছিলেন—মশায় আমাকে চিনতে পারলে না। ইচ্ছে করে, বুঝেচেন না, ইচ্ছে করে।

সুধাংশুবাবু অবিশ্বাস করেন নি নিত্যবাবুর কথা।

এ মেয়ে তা পারে।

তাঁকেও চিনতে পারত না; প্রায়ই তো যেত এই পথে; চাটুজ্জেবাড়ির কাজে ওর মা না গেলেও ও যেত। ইদানীং অর্থাৎ সে-সময় সেই ১৯৫০-৫১ সালে তার সেই রুগ্ন খ্যানখেনে ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে অথবা হাত পা ছুঁড়ে মাকে গালিগালাজ দিতে দিতে পিছনে পিছনে যেত। তিনি তাকিয়ে দেখতেন কিন্তু মেয়েটি কোনদিন তাকাতো না। কত দিন বর্ষার সময় সকালবেলা অকস্মাৎ বৃষ্টি নেমেছে, এ পথটার উপর এক তাঁর বাড়িতে গাড়িবারান্দা আছে, সেখানে অনেক লোক আশ্রয় নিতো কিন্তু ও কোনদিন আশ্রয় নেয় নি।

বিচিত্রচরিত্র মানুষ নিত্যরঞ্জনবাবু। পাটের দালালি করতেন। একটু প্রগল্‌ভ মানুষ ছিলেন। কিন্তু খারাপ মানুষ ছিলেন না। তার উপর খানিকটা সাহিত্যবার্তিকগ্রস্ত লোক ছিলেন। হৃদয়ের গড়নটাও ছিল কোন গভীর উপসাগরের মত। ভারী দুঃখের সঙ্গেই সেদিন বলেছিলেন—শিবেন ভটচাজের মহাসমাদরের মেয়ে তুই—তুই আজ চাটুজ্জেবাড়ি খেটে খাস, এতে কি কেউ খুশী হতে পারে? না এর জন্যে আমরা কেউ দায়ী? তোকে দেখে আমি ছুটে গেলাম। তার উপর তোর ছেলে—। আমাকে বললে কি জানেন? বললে—আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না। মাফ করবেন আমাকে। আমার ছেলেটার অপরাধ ক্ষমা করবেন। ও মরেও না—আমিও খালাস পাই নে। আমি মশায় হতবাক হয়ে গেলাম।

সেদিন নিত্যরঞ্জনবাবু দীর্ঘকাল পর বন্ধুকন্যাকে দেখে 'আরে আরে' বলে নিজে থেকে ছুটে গিয়েছিলেন ওর সঙ্গে কথা বলতে। তাঁর অর্থাৎ সুধাংশুবাবুর সঙ্গে তাঁর মাত্র দশ-পনের দিনের পরিচয়, তাতেও তাঁর সামনে এমন একটি দুর্নামযুক্ত মেয়েকে চেনেন একথা প্রকাশ করতে তাঁর সংকোচ হয় নি।

রাস্তার ওপারে তাঁর বাড়ির সামনে ওই যে ওই বাড়িখানা বিক্রি হয়েছিল এবং নিত্যবাবু

সেখানা কিনেছিলেন। কেনার সময় দিন দুই আলাপ করে গিয়েছিলেন। তারপর বাড়িটা সংস্কার করাতে শুরু করে নিত্য সকালে আটটা নটার সময় এসে হাজির হতেন। রাজমজুর লাগত, তাদের তদারক করতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে 'নেবার মশায়' বলে নমস্কার করে কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। রৌদ্রের উত্তাপ বর্ষার স্বল্পতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতেন। সুধাংশুবাবুর বেশ লাগত, উপভোগ করতেন তিনি। সেদিন এসেছিলেন বেশ ভোরবেলা। পাঁচটা বেজেছে। রাস্তায় লোকজন কম। খবরের কাগজওয়ালাদের সাইকেলের ঘণ্টা বাজছে, ছুটছে। ঝিয়েরা বাড়ি বাড়ি কাজ করতে যাচ্ছে। জমাদারদের নর্দমা ঠেলা হয়ে গেছে। নিত্যবাবু এসে এমনি সময় সেদিন হাজির হয়েছিলেন।

সুধাংশুবাবুই সেদিন নিত্যবাবুকে এত সকালে দেখে বলেছিলেন—আজ এত সকালে নেবার মশায়?

—ইয়েস স্যার, এত সকালেই বটে, বুয়েচেন না। কাল রাত্তিরে একজনের বস্তা চারেক সিমেণ্ট দিয়ে যাবার কথা ছিল। বিশ্বাসী আদমী, বুয়েচেন না। বলেছিল—ভাববেন না—মাল ঠিক পৌঁছে যাবে। বালির গাদার মধ্যে পাবেন। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।

একমুখ হেসে ফেলেছিলেন সুধাংশুবাবু।

মনে পড়েছিল খ্যাঁকশিয়ালীর ইংরিজী হল ফক্স। এবং বিশেষণ হল স্লাই। মানে চতুর। "A sly fox met a hen." হেসে মুখে বলেছিলেন—তা মিলল?

নিত্যবাবু বলেই চলেছিলেন—Yes yes yes. একেবারে অক্ষরে অক্ষরে কথা রেখেছে। জানেন, এ লোকগুলোকে যে যা বলবে বলুক—চোর ডাকাত গুণ্ডা অ্যান্টিসোসাল কথা উঠেছে আজকাল—তা যাই বলুক এরা যা কথা দেয় তার খেলাপ করে না। নে—ভা—র। ভদ্রলোক—দে—র চেয়ে অ—নে—ক—। হঠাৎ থেমে গেলেন নিত্যবাবু। বলে উঠলেন—আ—রে! বলে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। চলে গেলেন রাস্তা পার হয়ে ওপারে। সুধাংশু বাবু দেখলেন সেই মেয়ে সেই চাঁপা যাচ্ছে। সেই সদ্য স্নান করে ভিজে চুল পিঠে ফেলে—সুপরিচ্ছন্ন না হোক মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একখানি কাপড় পরে মুখ নিচু করে তির্যক দৃষ্টিতে আশে-পাশে দৃষ্টি রেখে সে চলেছে ধীর পদক্ষেপে।

নিত্যবাবু এই মেয়েটিকে দেখেই সবিস্ময়ে আরে শব্দটি উচ্চারণ করে বেরিয়ে গেলেন এবং হনহন করে গিয়ে ওই মেয়েটির কাছে দাঁড়ালেন। কয়েকটা কথা বললেন। চাটুজ্জেবাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে কি দেখালেন। তারপর একবার কপালে হাত দিলেন। মেয়েটি একটু পিছিয়ে গিয়ে যেন নিতান্ত অপরিচিতের মত ভ্রূকুঞ্চনের মধ্যে যে প্রশ্ন তুললে তার অর্থ হল—আপনি কে?

হঠাৎ এই মুহূর্তটিতেই ঘটল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। একটা ইঁটের টুকরো এবং কিছু বালি কেউ ছুঁড়লে এবং সেটা এসে খপ্ করে নিত্যবাবুর পিঠে পড়ল, পড়ল কিছুটা আশেপাশে। অতর্কিত এই আঘাতে—যদিও আঘাত তাতে কিছু ছিল না তবুও নিত্যবাবু "আরে বাপরে" বলে চীৎকার করে উঠলেন এবং পরমুহূর্তটিতেই নিত্যবাবু আঃ-উঃ ভুলে গিয়ে বালি-কাদার দাগ লাগা জামার

পিছনদিকটা সামনে টেনে এনে চোখের সামনে ধরে হতভম্বের মত দেখতে লাগলেন। মেয়েটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই চোখে আগুন জ্বলে উঠল। নিত্যবাবু তখন পিছনের দিকে তাকিয়ে সন্ধান করছিলেন এই কর্মের দুষ্কৃতিকারীটি কে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুবাবুও তাকালেন সেদিকে। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দা। শহর হলেও ঠাঁইটা বাজার নয় হাট নয়; এখানে একটা অতিক্ষীণ সমাজশৃঙ্খলা আছে। এবং সে শৃঙ্খলা এই স্থানীয় বাসিন্দাদেরই বাঁচিয়ে রাখতে হয়। যুগটা বিচিত্র যুগ শুরু হয়েছে। সুধাংশুবাবু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নূতন যুগের মানুষ। নতুনের এই অসহনীয় অশোভন অভ্যুদয়ের অবশ্যম্ভাবিত্বের কথা জানেন। এই নতুন জীবনস্রোতকে ভগীরথের মত শাঁখ বাজিয়ে সমুদ্রসঙ্গমে আনতে পারলে সৃষ্টি হবে মুক্তি-তীর্থের—আর সে স্রোত বিপথগামিনী হলে হবে কীর্তিনাশা—একথা তিনি জানেন। তবুও মস্তানীর জন্য পীড়া অনুভব না করে পারেন না।

দুষ্কৃতিকারীটিকে আবিষ্কার করতে দেরি হল না বা কষ্ট করতে হল না। যে এই দুষ্কৃতি করেছে সে পালিয়ে গেল না অথবা নিত্যবাবুর পিঠে কাদাবালির মুঠো লেগেছে বলে কোন সংকোচও অনুভব করলে না। সে যেন আরও কোন প্রবলতর আবেগে ভাল-মন্দ সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞানশূন্যের মত ওই ফুটপাথ ধরে এগিয়ে আসছিল।

একটা ছেলে। চিনতে দেরি হয় নি; এ সেই ছেলেটা। ওই মেয়েটার সেই ছেলেটা। সেই অহরহ খুনখুনে কান্না-কাঁদা ক্যাঁকলাসের মত রোগা সিঁটকে পাকানো চেহারার কটা চুল কটা চোখ ঘষা উজ্জ্বল তামার পয়সার মত গায়ের রঙ সেই ছেলেটা। ছেলেটা আগের থেকে একটু বড় হয়েছে—একটু শক্ত-সমর্থও হয়েছে। তার সেই চোখে হাত দিয়ে অসহায় এঁ্যা-এঁ্যা কান্নারও চেহারা পালটেছে। কান্নার সুরটা আর অসহায় নয়—তাঁর সঙ্গে ক্ষোভের ঝাল মিশেছে।

ছেলেটা দ্বিতীয়বার আক্রমণের উদ্যোগ করছিল। নিত্যবাবুকে নয়—নিত্যবাবুর সামনে তার মা তখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার চোখের দৃষ্টিতে তিক্ততার শেষ নেই, জ্বালায় সে চোখ নিষ্পলক হয়ে উঠেছে—যেন ছেলেটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাইছে। ছেলেটা তখন দ্বিতীয়বারের জন্য কুড়িয়ে নিলে একটা ইঁটের টুকরো। নিজের ঠোঁটের উপর দাঁতের খামচা কেটে মায়ের দিকে তাকালে।

সুধাংশুবাবু এবং নিত্যবাবু একসঙ্গে চীৎকার করে উঠেছিলেন—ফ্যাল্ ফ্যাল্—এই ছেলে ফ্যাল্—

সেই মুহূর্তেই তার মা তার সকল লজ্জা সংকোচকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে বলে উঠেছিল—মর মর—তুই মরে যা। তুই মরে যা। তুই মরে যা।

এবার ছেলেটা পালিয়েছিল। মায়ের ভয়ে নয়। সম্ভবতঃ সুধাংশুবাবুর ভয়ে। সুধাংশুবাবুর একটা পরিচয় ছিল ও অঞ্চলে।

সেদিন তাঁর কোর্ট ছিল না। হয়তো রবিবার ছিল। বা কোর্ট ছুটি ছিল।

নিত্যবাবু তাঁরই বাড়িতে ভিতরে গিয়ে জামাটা খুলে কলে কাদাটুকু ধুয়ে শুকুতে দিয়ে তাঁর

বসবার ঘরে এসে ঢুকেছিলেন, বাইরে থেকে কথা বলতে বলতেই আসছিলেন—যেন না বলে আর থাকতে পারছিলেন না। নিত্যবাবুর কথার প্রতি সেন্‌টেনসেই কয়েকটা করে 'বুয়েচেন না' শব্দ থাকত, সেই বলেই ঢুকেছিলেন—বুয়েছেন না সুধাংশুবাবু, অদৃষ্টের চেয়ে বলবান কিছু নেই মশায়। বুয়েচেন না, এই যে চামড়াঢাকা কপালখানা এইটেই হল সব। একেবারে মোক্ষম কথা—বুয়েচেন না। ওই যে মেয়েটা আর ওই যে ছেলেটা—বুয়েচেন না—তার একে বারে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সুধাংশুবাবু একটু আগ্রহান্বিত বিস্ময় অনুভব করেছিলেন। নিত্যবাবু ওদের জানেন অথচ ওদের পরিচয় তাঁর জানা হয় নি! ওর সে পরিচয় যত অপরিচ্ছন্ন এবং অপবিত্র হোক, ওদের বিশেষ করে ওই মেয়েটির কাছে তিনি উপকৃত। অযাচিতভাবে সে উপকার করেছে, তিনি নিয়েছেন। সেটা যেন একটা কাঁটার মতই বিঁধে রয়েছে তাঁর মনে। এবং বলেছিলেন—কে বলুন তো মেয়েটি? চেনেন? চাটুজ্জেদের বাড়ি কাজ করে, না?

নিত্যবাবু বলেছিলেন—বুয়েচেন না, হতভাগা মেয়ে। আমার চেনা মানে আমার বন্ধুর মেয়ে। আমার বন্ধু শিবেন ভটচাজ, বুয়েচেন না—এককালে হাওড়ার নামকরা ছোকরা। আমার বন্ধু। বলতে গেলে একগেলাসের ইয়ার। আমরা সেকালে, বুয়েচেন না, একটা দল ছিলুম। শিবেন আমি এবং আরও পাঁচ-সাতজন। আমাদের লক্ষ্য ছিল বেঙ্গলকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রভিন্স করে তুলব। ফ্যাক্টরী বানাব। তখন আপনার প্রথম মহাযুদ্ধের পর। বিপ্লবীদের কথা শুনে ব্লাড বয়েল করে ওঠে। তাদের মত তো প্রাণট্রাণ দিতে পারি না, তবে সাহায্য করতে পারি। আর তখন চাটুজ্জেরা কারখানা গড়ে তুলেছে, ১৯১০/১২ সালে ছোট একটা কারখানা ছিল—একটা পুরনো বয়লার, একটা ইঞ্জিন, দুখানা লেদ, তার থেকে যুদ্ধের ক'বছরে যাকে বলে মিলিয়নেয়ার। আরও সব বেশ কয়েকজন আরম্ভ করে ভালই করছে। মধ্যে মধ্যে স্যর পি-সির কাছে যেতুম। তিনি উৎসাহ দিতেন। ঘুষি মেরে খোঁচা মেরে যেন মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে বলতেন—কল-কারখানা গড়ে তোল্। হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। শিবেনের বাবা মারা গেল। হাতে অনেক টাকা এসে গেল। তাই দিয়ে পত্তন হল দধীচি আয়রন ওয়ার্কসের। শিবেনের বাবা ছিলেন খুব পসারওয়ালা মোক্তার। তিন ছেলে।—বেশ গুছিয়ে কথা বলতেন নিত্যবাবু। শিবেনের জীবনের কথাগুলি—ওই কারখানা পত্তনের কথা, শিবেনের দরাজ হাতের কথা—এই মেয়ের সমাদরের কথা বলে গেলেন। তারপর চুপ করলেন নিত্যবাবু। যেন হঠাৎ চুপ করে ভাবতে লাগলেন। বোধ করি ভাবতে লেগেছিলেন—তারপর কি?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—তারপর?

—তারপর?

—হ্যাঁ।

—তারপর বুয়েচেন না, ওই কপাল। ফেল পড়ল দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্। কিনলে ওই চাটুজ্জেরাই। ওই রায়বাহাদুর। বুয়েচেন না! এখন ওদের বাড়িতেই চাকরি করছে শিবেনের বউ। মধ্যে মধ্যে মেয়েটা একটিনি করে। শিবেনের দধীচি আয়রন ওয়ার্কসে একটাও বল্লম তৈরী হয় নি। খানকতক ছোরা তৈরী হয়েছিল। চা-বাগানের প্রুনিং নাইফের

অর্ডার নিয়ে তার সঙ্গেই তৈরী করেছিল। কারদিগে যেন দিয়েছিল। তারপর—।

আবার চুপ করে গিয়েছিলেন নিত্যবাবু।

সুধাংশুবাবু আবার বলেছিলেন অর্থাৎ কথা বলার ছলেই প্রশ্ন করেছিলেন—এত বড় ব্যাপারটা ফেল পড়ে গেল! পর্বত মূষিক প্রসব করেই দেউলে হয়ে গেল।

—তাই হল। পর্বতের মূষিক প্রসবই বটে। কি যে হয়েছিল তা বলতে পারব না তবে সাংঘাতিক কিছু। জালজালিয়াতি কিছু করেছিল শিবেন। প্রথমটা কারখানা করে ২৫/২৬ সাল থেকে কারখানা ভাল চালাতে পারে নি, অর্ডার ছিল চা-বাগানের অর্ডার। ওই চাটুজ্জে রায়বাহাদুরই ওঁর ছোট অর্ডারগুলো দিয়ে ওকে সাহায্য করতেন। ৩৪/৩৫ সালে হঠাৎ বাড়ি কারখানা চাটুজ্জেদের কাছে মর্টগেজ দিলে। মোটা টাকা নিয়ে এক সিনহার সঙ্গে জুটে একটা ব্যাঙ্ক করলে। ওদের সবার পিছনে ছিল এক মালিক। বুয়েচেন না! সে অগাধ জলের মাছ। লোকটা দালাল। জাপানী ফার্মগুলো তখন বেশ মজবুত করে ভিত গাড়ছে। তারা লোহা মানে পিগ্ আয়রন কিনবে—তার অর্ডার পাইয়ে দেবে বলেছে। ব্যাঙ্কেও টাকা রাখবে বলেছে। শিবেনের কারখানা ফাঁপতে লাগল। আমি নাটক লিখলাম। নতুন রত্নমালা স্টেজের প্ল্যান হয়ে গেল। হঠাৎ ব্যাঙ্কটা ফেল পড়লো, বেধে গেল জাপানী যুদ্ধ। জাপানীরা বললে, 'দিস টাইম উই গো বাট নেক্স্ট্ টাইম নট গো!' ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার দিব্যি জেলে চলে গেল। তার গেল না কিছুই। আর শিবেনের সব গেল। বাড়িঘর কারখানা মর্টগেজ ছিল—লিখে নিলে ওই চাটুজ্জেরা। কিছু টাকা দিয়েছিল চাটুজ্জেরা—সেও বহু অপমানের টাকা।

মাথা নিচু করে সত্য সত্যই লজ্জিত বেদনার সঙ্গে নিত্যবাবু বলেছিলেন—শিবেন কাপুরুষের মধ্যে বোধ হয় ওয়ার্স্ট কাপুরুষ। শিবেনের বউ ছিল সুন্দরী—১৯৪০।৪১ সালেও সে যুবতী ছিল। চাটুজ্জেদের বাড়ির বড়ছেলে—সে মারা গেছে—তার কাছে নাকি বিক্রি করেছিল শিবেন। চাটুজ্জে গিন্নী কথাটা জানতে পারে। সেই ভদ্রমহিলাই এর জন্যে শিবেনদের বসতবাড়ির পিছনদিকের খানিকটা ছেড়ে দিয়েছেন। এ চাকরিও সেই তাঁর চাকরি। শুনেছিলাম যতকাল শিবেনের বউ বাঁচবে ওদের বাড়ির ঠাকুরঘরের কাজ করে খেতে পাবে।

—কিন্তু এই মেয়েটি?

—সেই মায়ের কাছেই গেল বোধ হয়। আর আমাকে বলে গেল আপনাকে তো চিনি নে।

—না, তা নয়। জিজ্ঞাসা করছি—

—আমি সঠিক জানি নে সুধাংশুবাবু। বুয়েচেন না। তবে একাল তো সর্বনাশের কাল আত্মঘাতের কাল—।

চুপ করে গিয়েছিলেন নিত্যবাবু।

সুধাংশুবাবু বুঝতে পেরেছিলেন, মুখে আর কিছু বলেন নি। তাকিয়ে ছিলেন সামনের দিকে। মনে পড়েছিল সেই রাত্রির কথা। এবং ওর এই শুচিস্নাত রূপের মধ্যে রাত্রে ও যে রূপে ও ছন্দে রূপসী ও ছন্দময়ী হয়ে দাঁড়ায় তার আভাস সকালবেলায় জ্বলা আলোর মত জেগে থাকার কথা মনে পড়েছিল।

নিত্যবাবু হঠাৎ বলেছিলেন—শুনেছি she is the cause of her husband's death ; she sold herself,—আরও অনেক কথা শুনি। এর আগে আমি সেসব বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ দেখলাম she is a dangerous woman. ওইটে ওর ছেলে মশায়।

এর পরও আছে। এই মেয়েটির আর অনেক পরিচয় নৈমিত্তিক খুঁটিনাটির মধ্যে তাঁর কাছে এসে জমা হয়েছে। নদী যেমন বয়ে যাবার সময় বাঁকের মুখে খড়কুটো পলিমাটি রেখে যায়, তেমনিভাবেই ও সেসব পরিচয় রেখে গেছে।

নিত্যবাবু এরপর বাড়ি সম্পূর্ণ করে গৃহপ্রবেশ করলেন। স্থায়ী প্রতিবেশী হলেন। চার-পাঁচ দিন পরই একদিন এসে বললেন—জানলেন স্যার, শিবেনের স্ত্রীকে আমার বাড়ি রান্নার কাজের জন্য রাখলাম। বুঝেচেন না? মা'টা মেয়েটার মত না! হ্যাঁ। নাক চোখ ঘুরোয় না। বেশ বিনয়টিনয় আছে। আমি মশাই দাঁড়িয়ে ছিলাম বারান্দায়, শিবেনের স্ত্রী দাঁড়াল। চাটুজ্জে-বাড়ি থেকে ফিরছিল। আমাকে বললে—চিনতে পারছেন? বললাম—তা পারব না কেন। তবে ভয় হয় বাপু। সেদিন তোমার মেয়ে যে অপ্রস্তুতটা না আমাকে করলে! ওঃ, বললে, আপনাকে তো আমি চিনি না!

বললে—ও এমনি বটে। তবে কি বলব বলুন—সবই তো জানেন। বিস্তর দুঃখে পাথর হওয়ার মত এমনি হয়ে গেছে।...আপনাকে ওরা খুব চেনে। খুব সম্মান করে।...রান্নার লোক চাই তা বললাম—মেয়ে কি করে? চাটুজ্জেবাড়ির কাজ তুমি কর। ও সেই কাজেই মধ্যে মধ্যে যায়। তা ওকে দাও না আমার বাড়ির রান্নার কাজে। বললে—ওকে শুধিয়ে বলব। তা' কাল সন্ধ্যেবেলা বলে গেল আমার বাড়ির কাজ ও নিজে করবে। মেয়ে করবে চাটুজ্জেদের কাজ।

বললাম—সেই ভাল তাই কর।

এরপর থেকে ভোরবেলা মা এবং মেয়ে দুজনেই আসত একসঙ্গে—ওপাশের ওই নিত্যবাবুর ফুটপাথ ধরে হাঁটতো তারা আর পিছনে খানিকটা দূরে আসতো সেই ছেলেটা। সেই পা ঠুকে ঠুকে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে একটা দুর্বোধ্য গর্জন মেশানো কান্নার মত শব্দ করতে করতে আসতো সে।

মেয়েটির মা ঢুকত নিত্যবাবুর বাড়িতে। মেয়ে চলে যেত চাটুজ্জেবাড়ি। মেয়েটির মা-দিদিমা নিত্যবাবুর বাড়ি ঢুকবার সময় বলত—নীলু আয়—আমার সঙ্গে আয়। নীলু!

নীলু দৃকপাত করত না। সে সেই একভঙ্গিতে চলত মায়ের পিছনে পিছনে। মা সাধারণতঃ পিছন ফিরে তাকাতোই না। চলে যেত সামনে। বড় রাস্তার মোড় থেকে গলিপথে ঢুকে যেত। তারপর আর দেখতে পেতেন না সুধাংশুবাবু। তবে কোন কোন দিন কোর্টে বের হবার সময় দেখতে পেতেন ছেলেটা নিত্যবাবুর বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। কোনদিন বা নিত্যবাবুর বাড়িতে সংগৃহীত কোন একটা ছেঁড়া বই খুলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কোন কোন দিন দেওয়ালে মাথা ঠুকত। আর একটা খেলা করত সে। এখানকার কুকুরদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে খেলা করত। দু'তিনটে দেশী কুকুর তার সামনে উপু হয়ে বসে থাকত—

ছেলেটা তাদের সঙ্গে কথা বলত।

কোন কোন দিন মা দিদিমার দিকে বালি ঢেলা ছুঁড়ত।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতেন সুধাংশুবাবু। শুধু অবাক নয়, মনে মনে একটা অপরিমেয় ঘৃণা, তার সঙ্গে আরও কিছু, হয়ত মার্জনাহীন ক্রোধ, মেঘের মধ্যে লুকনো বিদ্যুৎপুঞ্জের মত আবর্তিত হত। দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেতেন একটা উগ্র পাপের মূর্তি যেন তিল তিল করে প্রতিদিন গড়ে উঠছে।

এক এক দিন এই মা— ;

এ কি মা ? রাক্ষসী হয়তো। অথবা প্রেতিনী !

মনে একটা ছবি ভেসে উঠল। খোঁচাখাওয়া অথবা ঢিলখাওয়া সাপিনীর ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফণা তুলে উঠে দাঁড়ানোর মত ওই ছেলেটার দিকে ঘুরে দাঁড়াত।

বাল্যকালে এই হাওড়াতেও সাপ দেখেছেন সুধাংশুবাবু। মানুষকে দূরে রেখেই সাপ চলে যেত মাথা নিচু করে। পিছনে পায়ের সাড়া উঠলে গতি দ্রুততর করত। কিন্তু কোন কোন দিন ফোঁস করে ফণা তুলে ঘুরে দাঁড়াত। নিষ্পলক সাপিনীর দৃষ্টি। চেরা জিভ লকলক করত।

ঠিক তেমনিভাবেই এই প্রেতিনী অথবা সাপিনী মা এক এক দিন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতো এবং তিক্ত কটু কণ্ঠে সোচ্চারেই বলে উঠত—মর মর তুই মর—তুই মরে যা ! আমি খালাস পাই !

ছেলেটাও থমকে দাঁড়াতো। সেও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত মায়ের দিকে। ঠোঁট দুটো নড়ত অথবা কাঁপত। দিদিমা এসে হাত ধরত ; না—ধরতে চেষ্টা করত। ছেলেটা ধরা দিত না। ছুটে পালিয়ে যেতো। তারপর এ মেয়ে চলে যেতো চাটুজ্জেবাড়ি—এর মা ঢুকত নিত্যবাবুর বাড়ি।

এরপর ছেলেটার মুখ ফুটল। সেও বলতে শুরু করলে—তুই মর তুই মর—তুই মরে যা। তারপর তার সঙ্গে যুক্ত হল—হারামজাদী শুয়োরের বাচ্চা— ! তারপর কোথা থেকে শিখলে—কুত্তি, কুত্তার বাচ্চি কুত্তি।

না। এ গালটা সুধাংশুবাবু ছেলেটার মুখে শোনেন নি। নিত্যবাবুকে বলেছিল মেয়েটির মা ছেলেটার দিদিমা। সেদিন সকালে ছেলেটা দিদিমার সঙ্গে এসেছিল কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। ব্যাণ্ডেজ তখনও কাঁচা রক্তে ভিজে ভিজে ছিল। ছেলেটার পদক্ষেপ ঠিক ছিল না, টলছিল। মা চলে গেল চাটুজ্জেবাড়ি —দিদিমা ছেলেটাকে নিত্যবাবুর বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে কাজে লেগে-ছিল। সেদিনটাও ছিল কোন ছুটির দিন। বাড়িতে বসে সুধাংশুবাবু তাঁর রাজনৈতিক কর্মী বন্ধুদের সাথে কথা বলছিলেন, হঠাৎ একটা গোলমাল উঠেছিল নিত্যবাবুর বাড়িতে।

সুধাংশুবাবু বারান্দায় বেরিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন ছেলেটার উপর ঝুঁকে পড়ে দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে ডাকছে —ওরে নীলু রে—ওরে ! ওরে ভাই রে সোনা রে !

নিত্যবাবু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কপালের ব্যাণ্ডেজটা তখন কেমন করে খসে বা খুলে পড়েছে এবং খানিকটা জায়গায় খানিকটা রক্ত পড়ে জমে রয়েছে। সুধাংশুবাবুই ডাক্তার ডেকেছিলেন। মোড়ের

মাথাতেই ডাক্তার আছে। ডাক্তার এসে দেখে শিউরে বলেছিল—এ যে অনেকখানি কেটেছে। যেন কেউ কিছুতে করে কুপিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে।

কুপিয়ে দিয়েছিল এই রাক্ষসী অথবা প্রেতিনী মা।

কথাটা প্রকাশ করে দিয়েছিল দিদিমা। দিদিমা বলেছিল—কি করব বলুন। তখন অনেকটা রাত্রি। চাঁপা গিয়েছিল সিনেমা দেখতে। ফিরে এল। এসে, নিজের খাবারটা গরম করে নিচ্ছিল। শীতের দিন তো। উনোনে ঘুঁটে দিয়ে চাটু চড়িয়েছে ছেলে এসে বসল ঝগড়া করতে। এ বলে তুই মর—ও বলে তুই মর। এরই মধ্যে ছেলেটা মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে বললে—কুত্তি কাঁহাকা, কুত্তার বাচ্চি কুত্তি! এই হাতে ছিল খন্তি, সেই খন্তি বসিয়ে দিলে মাথায়, লাগল কপালে, এতখানি কেটে গেল। ভকভক করে রক্ত পড়েছিল তখন। তখন আবার ন্যাকড়া পুড়িয়ে করালী করে লাগানো হল, তারপর উঠোনে গাঁদা গাছ হয়েছে তা থেকে পাতা বেঁটেও ভাল করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ কিরকম আবার রক্ত পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে—দুর্বল হয়েছে তো!

সুধাংশুবাবুকে কথাগুলো বলেছিলেন নিত্যবাবু।

ছেলেটা ভুগেছিল কিছুদিন। মরত, মরাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু গরীব এবং দুর্ভাগা যারা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক রেহাইটা মেলে না। সেখানে উল্টোটা হয়।

এরপর ছেলেটাকে দেখা যেতো না।

নিত্যবাবুই বলেছিলেন ছেলেটা স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

দেখা যেতো মধ্যে মধ্যে। শনিবার দিন নটা বাজলেই ছেলেটা এসে দাঁড়াতো নিত্যবাবুর বাড়ির দরজায়—বাড়ির চাবি নেবে।

রবিবার কোন কোন দিন আগের থেকে প্রচণ্ডতর আক্ষেপ বা বিক্ষোভের সঙ্গে পা ঠুকে হাত ছুঁড়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে আসত।

একদিন মাকে মারলে ঢেলা ছুঁড়ে। তাঁর সামনে। ওই রাস্তার উপর। সেদিন ওদের এই পথে যাওয়া-আসার ছকে খানিকটা ওলোটপালোট হয়েছিল। ছেলেটা সেদিন রাগ করে হনহন করে চলে যাচ্ছিল, তার পিছনে ছিল দিদিমা; সে তাকে ডাকছিল—নীলু ফের, ফিরে আয়। নীলু!

নীলু পিছন ফিরেই বলছিল—না না।

—নীলু!

—না!

এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—নী—লু!

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা, সাপের মত না, বাঘের মত ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁতে খামচ কেটে একমুহূর্তের মধ্যে কুড়িয়ে তুলে নিয়েছিল একটা ইটের টুকরো। এবং সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল সেই ঢেলাটা। সে তাঁর চোখের সম্মুখে ঘটেছিল। ছেলেটার সে ঢেলা ছোঁড়ার ছবিটা চোখের উপর ভাসছে এই মুহূর্তে। ঢেলাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। সজোরে এসে

লেগেছিল নীলুর মায়ের হাঁটুতে। সে জোর আঘাতের একটা শব্দ উঠেছিল। সেটাও আজ মনে পড়ছে। মেয়েটি দুই হাতে হাঁটু ধরে বসে পড়েছিল। নীলুর মায়ের মা ছুটে গিয়েছিল মেয়ের কাছে।

যত সে "চাঁপা চাঁপা" বলে নাম ধরে ডেকেছিল ততই এ মেয়েটি ঘাড় বেঁকিয়ে মুখখানা যথাসাধ্য বুকের মধ্যে গুঁজে লুকিয়ে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল—না না না। ডাকিস নে ডাকিস নে ডাকিস নে। তার অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে তা কোনদিন সুধাংশুবাবু ভেবে দেখতে চান নি।

ঘটনাটা তো খুব কিছু অস্বাভাবিক নয়।

এরকমটা ওই ধরনের জীবন যাদের তাদের পক্ষে অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক। খালি পায়ে যারা চলে তারা প্রমত্ত হলে হুঁচোটের আঘাতটা তাদের প্রাপ্য।

ওদিকে তখন চাঁপার চারদিকে ভিড় জমে গিছল। তাঁর মনে আবার প্রশ্ন জেগেছিল—আঘাত গুরুতর হয় নি তো?

ইতিমধ্যে প্রতিবেশী নিত্যবাবু বেরিয়ে এসেছিলেন। এবং কি হল কি হল বলে ছুটে গিয়েছিলেন ওই ভিড়ের মধ্যে। এবং নিত্যবাবুই তার হাত ধরে তাকে ভিড় থেকে বের করে এগিয়ে নিয়ে চাটুজ্জেদের পথটায় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন।

সুধাংশুবাবু তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ ওই ছেলেটিকে দেখেছিলেন। পিঙ্গল চোখ পিঙ্গল চুল শক্ত শীর্ণ দেহ। তারপর কখন যে নিত্যবাবু আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন তা খেয়াল ছিল না কিন্তু এরই মধ্যে ছেলেটা কোথায় চলে গিয়েছিল। সবশেষে সেদিন একটা আক্ষেপ হয়েছিল তাঁর—মনে পড়ছে মনে হয়েছিল যেন কোন অদৃশ্য বিচারকের আদালতের পিওন এসে তাঁকে বলে যাচ্ছে –এর কাছে তোমার দেনা আছে শোধ করছ না কেন?

রবিবার হলেও কয়েকজন মক্কেল এসে গিয়েছিল। তারাও ক'জন দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর কাছেই। ক'জন আপিসঘরে গিয়ে বসেছিল। তিনি তখনও ভাবছিলেন।

কি জানি কেমন করে এই ছেলে এবং এই মা মেয়েটিকে নিয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনা তাঁর সারা অন্তরময় ছড়িয়ে পড়ছিল। শুধু অন্তরময় কেন সারা দেশময়। একটা সহানুভূতি সেদিন অনুভব করেছিলেন এই হতভাগিনীর জন্যে।

কি হয়ে গেল সব?

ওই মেয়ে—ওই তো যেন চারিদিকে! গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে। ওঃ! ইংরেজ অ্যামেরিকা লাখে লাখে তাদের সৈন্যবাহিনী নামিয়ে দিলে। দেশের খাদ্যভাণ্ডার লুঠ করে দুষ্প্রাপ্য করে দিলে, হাওয়ায় নোট উড়িয়ে দিলে। ময়দানে বসে গেল দেহের বিক্রির হাট।

যারা বাজারে এসে পা দিল তারা আর ফিরে গেল না। দেশ স্বাধীন হল কি হল না কে জানে —হিন্দু ধরলে ছুরি মুসলমান ধরলে ছুরি—মারলে পরস্পরের বুকে—রক্ত ঝরল—সে রক্ত আজও ঝরছেই ঝরছেই। দেশ ভাগ হয়ে গেছে তবু ঝরছে। এখন আর হিন্দু মুসলমান বিরোধের

প্রয়োজন নেই—তোমার সঙ্গে আমার—তোমার সঙ্গে তার কিংবা তার সঙ্গে তার বিরোধ হলে সে বিরোধের মীমা'সা পৃথিবীর আদিম মীমাংসার পথে। খানিকটা রক্তপাত। পথে যেখানে দুজনে চলা যাবে না তখন একজনকে যেতে হবে।

ঠিক এই সময়েই চাঁপাকে চাটুজ্জেদের গলিতে অথবা দোরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছিলেন নিত্যবাবু। তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজের বাড়ি না ঢুকে নিত্যবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— দেখলেন কাণ্ডটা!

তিনি বলেছিলেন—আমি সবটাই দেখেছি। আর শুধু আজকের ঘটনা নয় রোজই দেখি। হঠাৎ আজ—

—পাখা গজায় নি এতদিন। আজ গজালো। একেবারে মস্তান হয়ে গেল।

একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—দিদিমাই ওর মাথা চিবিয়ে খেয়ে দিলে।

তিনি কোন উত্তর দেন নি।

এই হতভাগিনী মা-টির উপর করুণা করতে চেয়েও কোনমতেই এতটুকু করুণা তাঁর মনে সঞ্চারিত হয় নি। করুণা তো কেউ কাউকে করে না—করুণা আপনা থেকে সঞ্চারিত হয়। শুষ্ক হৃদয় আপনা-আপনি সজল হয়ে ওঠে। তার কারণ থাকে। এ মেয়েটির পক্ষে সে কারণ নেই। এর জন্যে তা হয় নি।

তিন

তারপর অনেক দিন চলে গেছে।

নিত্যবাবু নেই। তিনি গত হয়েছেন। এ মেয়েটির মা সেও নেই, মারা গেছে। মেয়েটি আছে। তার কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় নি।

এই অনেক দিনে বয়স তার বেড়েছে—চেহারায় কিছুটা যেন ভারী দেখায় কিন্তু তাতে তার ওই যে প্রেতিনী রূপ তার এতটুকু ইতরবিশেষ হয় নি। বরং প্রেতিনীত্বের মধ্যে যে একটি মোহ বা মোহিনীত্ব থাকে তা যেন বেড়েছে।

আজও চাটুজ্জেদের বাড়ির কাজটা সে রেখেছে। সে কাজ সে করে। ভোরবেলা সে যায়। সেই স্নান করে শুচিস্নাত হয়ে শৌখিন সায়া ব্লাউজের উপর ফিতেপাড় শাড়ি পরে যায় এবং আসে।

সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না। সুধাংশুবাবুও আর ভোরবেলা রাস্তায় এসে দাঁড়ান না। তবে যেদিন দাঁড়ান সেদিন ঠিক দেখতে পান সেই মেয়ে চলেছে সেই মনোহারী কেশবিন্যাসছন্দটি বজায় রেখে—সেই চুলের রাশির উপর আধঘোমটা টেনে মাথাটি একটু হেঁট করে চলেছে। আজকাল আর ছেলেটাকে দেখেন না। সে আর তার পিছনে পিছনে হাঁটে না। তবে তার কথা অনেক শোনেন।

পড়া ছেড়েছে। নেশা করে। আরও অনেক কিছু করে।

বোমা ফাটার শব্দ হলে ছেলেটার কথা ওঠে।

দু'দলে মারামারি হলে একদলে-না-একদলে ও থাকেই। মধ্যে মধ্যে পুলিসে ধরে নিয়ে যায় আবার ছেড়ে দেয়। মোট কথা সে তার জীবনক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে। মায়ের পিছনে সে আর হাঁটে না। বছর তিনেক থেকে হাঁটে না। মা এখন একলাই হাঁটে।

লোকে বলে—। লোকে অনেক কথা বলে।

যা বলে তার প্রতিটি অক্ষর সত্য না হলেও যা বলে তার অর্থ সত্য—সে সুধাংশুবাবু জানেন। তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠছে খাটের তলায় খালি মদের বোতল গড়িয়ে পড়ে ছিল। ভর্তি বোতলও ছিল।

সেই মেয়ে চোখে জল নিয়ে এই সন্ধ্যায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুধাংশুবাবু এখন অনেক বড় হয়েছেন। পুরনো বাড়ি সংস্কার করে নতুন হয়েছে। আর একটা তলা উঠেছে। পাশের দিকে বেড়েছে। গাড়ি হয়েছে। এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁর জীবনের গতিবিধি স্বভাব অভ্যাস সব কিছুর খবর রাখে। সপ্তাহের এই শনিবারের সন্ধ্যাটি তাঁর একান্তভাবে নিজস্ব। মিটিং- টিটিং হলে যান, রাজনীতির সঙ্গে যোগ তাঁর আছে। সেখানে কোন স্বার্থ তাঁর নেই কিন্তু একটা আদর্শ তাঁর আছে। এ ছাড়াও নানান প্রতিষ্ঠানও তাঁকে ডাকে। কখনও কখনও সিনেমা থিয়েটার দেখার নিমন্ত্রণও আসে। এ সন্ধ্যায় কারুর সঙ্গে তিনি দেখা করেন না—এ কথাটা বাইরে বোর্ডেও লেখা আছে।

চাঁপার ;—

হ্যাঁ, চাঁপাই ওর ডাকনাম—ভাল নাম রত্নমালা।

চাঁপার চোখের কোলে-কোলে জলের ধারার দাগ দুটি চিকচিক করে উঠল এই মুহূর্তটিতে। মধ্যে মধ্যে নতুন জলের ফোঁটা গড়িয়ে এলেই ঘরের আলোর ছটা প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। মিনিট কয়েকই দাঁড়িয়ে আছে। এমনই ভাবে হাত জোড় করে মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলতেও সাহস করে নি। তিনিও কথা বলেন নি। বিস্ময়ের আর তাঁর অবধি ছিল না।

প্রথমেই মনে হয়েছে এই প্রেতিনী তাঁর দোরে এসে দাঁড়াল কেন ?

প্রথমেই একবার মনে হয়েছিল দরজার পাল্লা দুখানা জোরে ঠেলে দিয়ে ওর মুখের ওপরই বন্ধ করে দেন। কিন্তু পারেন নি। কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়েছিল বারো বছর আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সেই বীভৎস এবং ভয়ানক রাত্রে অন্ধকার গলিপথের উপর দরজা খুলে দিয়ে তাঁকে একটি মেয়ে, সে-মেয়ে এই মেয়ে, বলেছিল তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে আসুন। তাড়াতাড়ি।

তারপর গভীর রাত্রি পর্যন্ত যতক্ষণ না দাঙ্গার আস্ফালন এবং বীভৎসতা স্তব্ধ হয়েছিল ততক্ষণ তাঁকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বাইরে বসে থেকেছিল।

আজও পর্যন্ত তার বিনিময়ে কোন দাবি সে করে নি। পরিচয়ের দাবিও না। একবার একটা মামলার কাগজ নিয়ে এসেছিল—টাকাপয়সা দেনাপাওনার পেটি কেস- কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিশ্রী

কাণ্ড ঘটেছিল। উপকারের প্রত্যুপকার তা সে যতটুকুই হোক তার সুযোগ দিতে এসেও এই উদ্ধত দর্পিতা মেয়েটি দেয় নি। হাত পেতেও হাত গুটিয়ে যেন প্রত্যাখ্যান করেছিল। আজ সে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে জল টলমল করছে। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না কি করবেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হয়তো তিন মিনিট -হয়তো তার থেকে বেশী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে ভাবছেন। মনে পড়ছে পিছনের কথা।

এ স্তব্ধতা ভঙ্গ সেই কবলে প্রথম ভীত ও মৃদু কণ্ঠে সে তাঁকে ডাকলে—একান্ত দীনজনের মতই ডাকলে—বাবু।

সে কি তবে ভিক্ষাপ্রার্থিনী? অর্থ? অর্থ চাই?

তিন বা চার পা। গলায় সোনার বিছেহার চিকচিক করছে। কানে টাপ রয়েছে। হাতে তিন বা চারগাছি করে বরফি চুড়ি রয়েছে।

তিনি অত্যন্ত নীরস কণ্ঠেই বললেন—এত রাত্রে? কি প্রয়োজন তোমার? বল।

মেয়েটির চোখের কোল জলের উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। কিছু বলতে গিয়ে প্রথমটা পারলে না। তারপর বললে -আমাকে বাঁচান, বাবু, আমার--আমার—

কণ্ঠস্বর তার দ্বিতীয়বার রুদ্ধ হয়ে গেল। মুখের উপর কাপড় চাপা দিয়ে সে হুহু করে কেঁদে উঠল।

সুধাংশুবাবুকে স্পর্শ করল সে বেদনার ছোয়াচ। একটু সহৃদয় হয়েই তিনি বললেন—কেঁদো না, বল কি বলছ?

একটু অপেক্ষা করে বললেন—কি হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির চরিত্র এবং তাঁর ফৌজদারী আদালতে খ্যাতির সঙ্গে যোগাযোগ করে একটু বক্রহাসি না হেসে পারলেন না। বললেন—কি কেসে পড়েছ? ঘরে মদ বেরিয়েছে? না—। কি? কি হয়েছে বল।

এবার কোনমতে আত্মসংবরণ করে চাঁপা বললে—আমার নীলু—আমার নীলুকে আপনি বাঁচান বাবু। লোকে বলছে, আমিও জানি আপনি পারেন।

—নীলু? মানে? মনে পড়ল না প্রথমটা।

—আমার ছেলে। আমার নীলু।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ—।

মস্তান--।

আশ্চর্য! আরবী ভাষা পারসী ভাষা তুর্কী ভাষা যারা এনেছিল এদেশে, এদেশের ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে উর্দু ভাষা যারা তৈরি করেছিল তারা বাংলাদেশে বক্তিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ অধিকার থেকে পলাশীর যুদ্ধ উধুয়ানালা বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত কর্মদিন রাজত্ব করে নি—তারা এই পাচ ছ'শো বছরে দিয়েছে অনেক কিন্তু এই মস্তান শব্দটি এবং মস্তানী রূপটি তাদের রাজত্বকালে বাংলাদেশে চালু হয় নি—হঠাৎ এতকাল পরে শব্দটি এবং শব্দের বাস্তবরূপটি আরব্যউপন্যাসের কোন বোতলের ছিপি কাটিয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাড়িয়েছে।

১৯৬০ সাল এখন—এখন বারো তেরো থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর পর্যন্ত সব মানুষই যেন

মস্তান হয়ে গেছে।

একজন পনের ষোল বছরের ছেলে যখন কোন বাড়ির মধ্যে ঢুকে অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বলে—মাসীমা, সতু কোথায়? একবার ডেকে দেবেন!

তখন মাসীমা বিবর্ণ হয়ে যান নির্বাক হয়ে যান। মাসীমা সতুর মা। তিনি জানেন রামুর হাতে ছুরি আছে। এবং সে ছুরি সতুর বুকে বা পেটে বসিয়ে যখন দেবে তখন একবারও হাত কাঁপবে না।

১৯৬০ সাল পর্যন্ত রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত মহা-আবির্ভাবের সব পুণ্য ফুৎকারে উড়ে গেছে। কোন্ মহাশূন্যে ধুলো হয়ে উড়ে হারিয়ে গেছে; তার উপর—

মনে পড়ল নীলুর এবং নীলুর মায়ের এবং নীলুর মাতামহের ইতিহাস। জন্মগত পাপ ছেলেটার রক্তের মধ্যে কীর্তিনাশার কুটিল ধ্বংসের প্রবৃত্তিতে আবর্তিত হচ্ছে।

আশ্চর্য কি?

একটু বিষণ্ণ হাসির রেখা ঠোঁটের কোন এক কোণে ফুটে উঠল আপনাআপনি। জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু মারলে কেন? কারণটা কি? টাকাকড়ি ছেনতাই? না জুয়োটুয়ো—?

—না না। বাবু কারণ আমি—।

নিজের কপালে হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে মেয়েটি বললে—আমি তার কারণ। আমার জন্যে—

—তোমার জন্যে? বিস্ময়ের আর সীমা রইল না সুধাংশুবাবুর।

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, আমার জন্যে। ওই বরেন মল্লিক ছিল—। থেমে গেল মধ্যপথে। আকস্মিকভাবে।

কঠস্বরে সুধাংশুবাবু বললেন—হ্যাঁ—। ওই বরেন মল্লিক ছিল—। কি ছিল? বল।

—ছিল—

কঠিন স্বরে সুধাংশুবাবু বললেন—হ্যাঁ—। কি ছিল তাই বল। মনে মনে বললেন—বুঝেছি। তুমি প্রেতিনী সে প্রেত। তা স্বীকার করতে এখনও তোমার লজ্জা!

মনে মনে অকারণে নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিলেন তিনি।

তবু সেই একটি রাত্রের কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। আবার তিনি কিছুটা কোমল হবার চেষ্টা করে বললেন—বল। আদালতের ব্যাপার—এখানে না বললে তো চলবে না!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে—কি বলব তাই ভাবছি। কি ছিল? এক বিচিত্র জাতের হাসি হেসে বললে—সে-কালে শুনেছি কেনা দাস-দাসী ছিল। বরেন মল্লিকের কাছে আমি ছিলাম তাই। আমাকে সে কিনেছিল। নগদ টাকা গুনে দিয়েছে। দলিলে সই করিয়ে নিয়েছে।

—দলিলে সই করিয়ে নিয়ে সে কিনেছিল তোমাকে? চমকে উঠলেন সুধাংশুবাবু। চাঁপার কথার মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা ছিল না—এবং সুধাংশুবাবু একজন বড় অপরাধ আইন বিশেষজ্ঞ—তিনি বহু বিচিত্র প্রথা ও ঘটনার কথা জানেন তবু তাঁর প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময় প্রকাশ না পেয়ে

পারলে না। এবং সে বিস্ময় অনেক বিস্ময়। এমন কোন কথা তো তাঁর প্রতিবেশী নিত্যবাবুর কাছে তিনি শোনেন নি। না! কোন আভাসই সে তো দেয় নি।

চাঁপা স্পষ্ট ধীর কণ্ঠস্বরে উত্তর দিলে—একবার নয় দুবার। প্রথমবার বাবার সামনে দু'হাজার টাকার নোটের গোছা আমারই হাতে তুলে দিয়েছিল। বাবা বলেছিল—নে মা নে, আমাকে বাঁচা। নইলে আমাকে জেলে যেতে হবে। পুতুলের মতই আমি নিয়েছিলাম। মল্লিক বলেছিল—বাবাকে দাও ও গুনে নিক আর শোন—এ ছাড়াও তোমাকে গহনা দেব—পোশাক-আশাক কাপড়চোপড় দেব। তবে কোনদিন আমার স্ত্রীর দাবি করতে পাবে না। গহনাও সে আমাকে দিয়েছিল। সেও বাবা বেচেছে মা বেচেছে সে বেচেছে। আমি? আমিও বেচেছি। একটুক্ষণের জন্য চুপ করলে চাঁপা, তারপর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে গেল—কোন কথা আজ আপনার কাছে গোপন করব না। সেদিন যেদিন দু'হাজার টাকায় প্রথম বিক্রি হলাম, সেদিন ওই লোকটার কথা শুনে আমার শরীর যেন কাঠ হয়ে গিছল, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল—আমার গলাও যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনের মধ্যে কোন বলবার কথা খুঁজে পাই নি—হারিয়ে গিয়েছিল। আমি কোন কথা বলি নি বলতে পারি নি। শুধু বসেই ছিলাম। বাবা আমার হাত থেকে নোটের গোছাটা টেনে নিয়ে কখন একসময় নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিছল। তারপর—

দু'হাতে মুখ ঢাকলে চাঁপা।

সুধাংশুবাবুও নির্বাক হয়ে গেলেন। শুধু নির্বাক নয়, যেন নড়াচড়ার শক্তিও তাঁর ছিল না।

এত বড অপরাধ, আইনের উকীল, তিনি জানেন ভূমি আর নারী এই নিয়েই যত অনর্থ ঘটে পৃথিবীতে। ভূমির চেয়েও বোধ হয় নারীর হাট বেশী বিস্তৃত। বাপ বিক্রি করে কন্যাকে, মা বিক্রি করে কন্যাকে, স্বামী বিক্রি করে স্ত্রীকে, ভাই বিক্রি করে বোনকে, নারী নিজে বিক্রি করে নিজেকে।

পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ মহাভারতের শ্রেষ্ঠ ধার্মিক এবং মহৎ জন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশার জুয়াখেলায় পণ রেখে হেরেছিলেন।

অনেকক্ষণ পর সুধাংশুবাবু বললেন—এস ভিতরে এস। বস ওই চেয়ারে। বল তোমার ছেলের কেসের কথা!

—আমার নীলু--।

দু'চোখ থেকে দুটি জলের ধারা আবার গড়িয়ে এল। চেয়ারের উপর বসে হাত দুখানি কোলের উপর রেখে বলতে আরম্ভ করেছিল।—আমার নীলু—বলেই কিন্তু থেমে গেল। থেমে গেল বলা ঠিক হল না; কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা দুটি আপনি বন্ধ হল এবং দুটি জলধারা গড়িয়ে পড়ল দুটি চোখ থেকে।

—নিজেকে একটু শক্ত কর। ভেঙে পডলে চলবে না। শান্ত হয়ে আস্তে আস্তে বল। গুছিয়ে

পরিষ্কার করে বল।

—আমার নীলু আমার গরুড়।

—গরুড়? কি বলছ?

—পুরাণের গরুড়ের কথা বলছি। তার মা বিনতার দাসীত্ব মোচন করেছিল অমৃত এনে। মল্লিকের বুকে পেটে ছুরি মেরে তাকে ফেলে দিয়ে নীলু পালিয়ে যাবার সময় আমাকে বলেছিল —যা এবার তুই খালাস। ইচ্ছে করে তোকেও শেষ করে দি। তা থাক। তুই মা। এর পর কিন্তু তুই যদি এ পাপ করিস তাহলে আমি বেঁচে থাকলে তোর রক্তে আমি চান করব।

আমি পাথর হয়ে গেলাম। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলাম ফুটপাথের উপর। নীলু ছুরি উঁচিয়ে ছুটে ঢুকে গেল গলির মধ্যে। মল্লিকের রক্তে আমার কাপড়চোপড় লাল হয়ে গেল। লোকজন জমে গেল; পুলিস এল, গলিটার ওদিক থেকে কতকগুলো লোক নীলুকে ধরে নিয়ে এল—তারা ধরেছে নীলুকে।

আপনি দেখেছেন সে গলি।

আমার কাছে এসে আমাকে ফুটপাথের উপর রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে নীলু বললে —যাঃ, তুই এবার নিষ্কণ্টক। আমার ফাঁসি হবে। আর কেউ তোর পথ রুখে দাঁড়াবে না।

তারপর বললে—এরপরও যদি তুই এ-পাপ করিস তবে তোর যেন কুষ্ঠ হয়। যদি না হয় তবে ফাঁসি গিয়ে প্রেত তো আমি হবই। সেই প্রেত হয়ে ভগবানের বুকে গিয়ে ছুরি বসাব আমি। তারপর মরা ভগবানটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কবর দিয়ে দেব নরকের পাঁকের মধ্যে!

শিউরে উঠলেন সুধাংশুবাবু।

চাঁপা বললে—পাপ কার তা' আমি জানি না। তবে পাপের পাঁক আমি সর্বাঙ্গে মেখেছি। আপনি একদিন স্বচক্ষে দেখে এসেছেন আমার সে পাঁক-মাখা চেহারা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এমনি সেজে আমাকে বসে থাকতে হত। আর যে লোকটা সেদিন জানালায় টোকা মেরে কথা বলেছিল—যাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম সেই লোকটাই মল্লিক। সেদিন সেই দাঙ্গার অবস্থা বলেই সে ফিরে গিছল। নাহলে সে ফেরবার মানুষ ছিল না। সে একটা জন্তু। নিষ্ঠুর জন্তু। সাপের মত। কুমীরের মত। আমার বাবা টাকার জন্যে বিক্রি করেছিল আমাকে; সে আজকের কথা নয়। কুড়ি বছর আগে। তখন আমার বয়স ষোল। আজ পনের বছর ধরে ওই অজগরটা ওই কুমীরটা আমাকে তিল-তিল করে গিলেছে। কঠিন জীবন আমার, আমি মরি নি।—সে কেঁদে ফেললে এতক্ষণে। সুধাংশুবাবু একটু নড়েচড়ে বসলেন।

বহুদর্শী মানুষ তিনি। অনেক অপরাধী ঘেঁটেছেন—অনেক অপরাধ দেখেছেন; তিনি জানেন সত্য এবং ভাবাবেগ সূর্যের আলো এবং রঙিন চশমার মত অথবা আলো এবং রঙিন ফানুসের মত। রঙিন বাল্‌বের বিচিত্র খেলায় রঙ্গমঞ্চে পর্দার উপর ঘনঘোর মেঘপুঞ্জ ভেসে যায়; দূরে পাহাড়ের মাথা থেকে মিথ্যা নদীর জলপ্রপাত ঝরে পড়ে, মিথ্যা সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দিন রাত্রির মায়ার সৃষ্টি করা যায়। সে হয়তো রঙ্গমঞ্চের সত্য, নাটকের সত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা

ঘটনাবর্ত। তার পটভূমি আছে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত আছে, অকৃত্রিম দিন-রাত্রিতে একটা কাল আছে; অনেক হাসি-কান্নার আবেগও আছে। কিন্তু সে আবেগ চাঁপার আজকের আবেগ নয়। চাঁপার আবেগ আজ রঙ্গমঞ্চের রঙিন আলোর মায়াবিভ্রম হয়ে উঠে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাছাড়া নারী যখন দেহকে আঁকড়ে ধরে তখন সে ছলনাময়ী। মিথ্যাবাদিনী।

সুধাংশুবাবু বাধা দিয়ে বললেন—দাঁড়াও। একটা প্রশ্ন করব।

চাঁপা চুপ করলে এবং সুধাংশুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সুধাংশুবাবু বললেন —পনের বছর আগে তোমার বাবা মল্লিকের কাছে দু'হাজার টাকা নিয়েছিল—পনের বছর তুমি এই মল্লিকের রক্ষিতা হয়ে আছ—

দুই হাতে মুখ ঢাকলে চাঁপা।

সুধাংশুবাবুর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। তিনি বললেন—তুমি বলছ এতদিন তার কাছে থেকেও তুমি তার প্রতি অনুরাগিণী ছিলে না? তোমার আসক্তি ছিল না?

মুখ ঢাকা হাত দুখানা সরিয়ে নিয়ে ভুরু কপাল কুঁচকে বোধ করি ভেবে নিলে চাঁপা।

সুধাংশুবাবু বললেন—সব তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে, এই কথা বিশ্বাস করতে বল?

চাঁপা মুখ নত করলে এবার, তারপর বললে—না, তা বলব না। সংসারে দেহের একটা কামনা আছে—পেটের ক্ষিদের মত একটা ক্ষিদেও আছে। অভ্যাসেরও একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু এই তো সব নয়। দেহের পরে মন আছে। দেহের ক্ষিদে মিটে গেলে মন কেঁদেছে, দেহকে তিরস্কার করেছে। প্রতিজ্ঞা করতে বলেছে—কতবার প্রতিজ্ঞা করেছে—আর যাব না আর যাব না আর যাব না। সে চেষ্টাও করেছি। যাই নি। বাড়ি থেকে বের হই নি। বাড়ির দরজা বন্ধ করে থেকেছি। তারপর শুরু হয়েছে অদৃশ্য অজগরের পাকের চাপ।

আপনার মনে আছে? একবার মা আর আমি দেনার জন্যে নালিশের সমন নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম? ওই মল্লিকই নালিশ করেছিল। এ টাকা নিয়েছিল আমার স্বামী।

সুধাংশুবাবুর মনে পড়ে গেল আর একটি সন্ধ্যার কথা। তাঁর আপিসঘরে চৌকির উপর সামনেই বসেছিল এই চাঁপা। সেও প্রায় বারো বছর আগে। তখনকার চাঁপা ছিল তরুণী। মনে পড়ছে তার পিঠ ধরে তাকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিল সেই রুগ্ন ছেলেটা। মাথার চুলগুলি পিঙ্গল কোঁকড়ানো, চোখের তারাও পিঙ্গল, গায়ের রঙ তেমনি পিঙ্গলাভ গৌর; দুই হাত দিয়ে মায়ের মাথার কাপড় ধরে টেনেছিল; সঙ্গে সঙ্গে এই মা ফণাতোলা সাপের ছোবল মারার মত তার ডান হাতের ঝটকা দিয়ে ছেলেটাকে যেন ছোবলই মেরেছিল। ছেলেটা টাল সামলাতে পারে নি—তক্তাপোশের উপর থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল মেঝের উপর। আর্তনাদ করে কেঁদে উঠেছিল ছেলেটা। সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুবাবু ফেটে পড়েছিলেন নিষ্ঠুর ক্রোধে, বলেছিলেন —এই নির্লজ্জ নষ্ট মেয়ে কোথাকার!

মেয়েটা চকিতের মত দপ্ করে জ্বলে উঠে তাঁর দিকে তাকিয়েই যেন নিভিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। এবং পরক্ষণেই বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে মাকে বলেছিল—বেরিয়ে আয় এখান

থেকে মা।

সেদিনও সুধাংশুবাবু তাকে বিচার করবার সময় সুবিচার করেন নি। মেয়েটির ওই আচরণের জন্য তাকে নষ্ট বলার হেতু ছিল না। সে কথাটা যেন আপনা থেকে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। হয়তো ওই বেদনা দুঃখে আহত মেয়েটির আজকের মাতৃরূপটিই আজকে তা মনে করিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, সুধাংশুবাবু আজ যেন সত্যই বাস্তবের চেয়ে কিছু বেশী অনুভব করছেন এই মুহূর্তে।

মনে পড়ল চাঁপার নাম রত্নমালা।

ওর স্বামী ছিল—তার নাম ছিল প্রণবকুমার চক্রবর্তী। সে তখন বিধবা কিন্তু সারা অবয়বে ছিল স্বৈরিণীর পরিচয়।

সেদিন চাঁপার জীবনের পাপের ছাপ গোপন ছিল না। তবে তার সঙ্গে একটা দর্পিত ঔদ্ধত্য ছিল। আজও সে পাপের ছাপ মোছে নি। অনেক চোখের জলে সে নিজেকে ধুয়েছে; তবু মোছে নি। কিন্তু সে ক্ষোভ তার নেই। ক্ষোভ তার মুছে গেছে।

চাঁপা বললে—রূপ আমার ছিল, তখন আমার অল্প বয়স—বয়স কত হবে? ষোল বছর। সদ্য বিয়ে হয়েছে। বছর ঘোরে নি। মা বাপের একমাত্র মেয়ে। বাপ তখনও একটা ফ্যাক্টরীর মালিক। জীবনে অনেক সাধ স্বপ্ন। যুদ্ধের ঝড়ে সে-সব উড়ে গেল। আমি উড়ে গেলাম না—ভেসে গেলাম না—না খেয়ে মরলাম না—বিক্রি হয়ে গেলাম। দেহ বিক্রি করে দিলে বাপ—দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করতে পারলাম না তাই আত্মাও বিক্রি হল আমার।

চার

বাবা ছিল বিচিত্র মানুষ। ফাঁকা শূন্য মাটির কলসীর মত মানুষ। বিয়াল্লিশ সালে যুদ্ধের বাজারে যখন সকলে লাভ করলে তখন বাবার হল দেনা। তার একটা কারণ হল সে সময় যে স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনের জন্য মিলিটারী কনট্রাক্ট নেয় নি। তার উপর চাটুজ্জেবাবুদের কাছে কোন একটা কনট্রাক্টের মাল দেয় নি বলে খেসারতের দায়ী হয়েছিল।

বাবার কথা হয়তো জানেন। বাবা সেকালের লোক। মদ খেতো, থিয়েটার-পাগল ছিল, চরিত্রদোষও ছিল কিন্তু তার সঙ্গে আশ্চর্য ভাবে স্বদেশীপাগলও ছিল। বিয়াল্লিশ সালে সাইক্লোন হয়ে বাংলাদেশ ভাসিয়ে দিয়েছিল উড়িয়ে দিয়েছিল—সারা কলকাতা শহরে মেদিনীপুরের আর চব্বিশ পরগণার মানুষেরা এসে ফ্যান আর এ টোকাঁটা ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিল—পথের ধারে পড়ে মরছিল যখন, তখন বাবা আমার মাস কয়েক—তা মাস ছয় সাত একটা লঙ্গরখানা চালিয়েছিল।

থাক।

এসব বলে আজ কি লাভ?

কোন লাভ নেই। থেমে গেল চাঁপা।

সুধাংশুবাবু বললেন—বল। আমি শুনছি।

চাঁপা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নিজে আমি নিজেকে বিক্রি করি নি আপনি এইটুকু

বিশ্বাস করুন। এ দেশের সে-কালকে আপনি জানেন না—সে-কালে আমার মত অনেক মেয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিক্রি হয়ে গেছে। হয়তো সকল কালেই হয়। কিন্তু এই যুদ্ধের কালের মত এমন করে মা বাপের সংসারের পেটের দায়ে হাট বসিয়ে মেয়ে কখনও বিক্রি হয় নি। তাদের কার কি হয়েছে তা আমি জানি না। আমি আমার কথা বলছি। তাদের হয়তো অধিকাংশই মরে খালাস পেয়েছে। কত জনে এটাকেই জীবনে সইয়ে নিয়েছে। দিব্যি ঘর বাহির বজায় রেখেছে। কোন জ্বালা নেই কোন সংশয় নেই। শুধু আমিই মরতে পারি নি, মরি নি; বেঁচে থেকেও সইয়ে নিতে তো পারি নি। আজও পাপের পঙ্কে ডুবে আছি। সেই পাঁকের রসই আমি নিত্য পান করি। আমার সারা দেহ মন জ্বলে যায়। একটু থেমে তারপর বললে যেদিন বাবা আমাকে বেচলে, দু'হাজার টাকার নোট মল্লিক আমার হাতে দিলে, বাবা আমার হাত থেকে নিয়ে বেরিয়ে এল, আমি পঙ্গু হয়ে বসে রইলাম ঘরের মধ্যে, ঘরের আলোটা নিভে গেল। এরপর আমাকে বিশ্বাস করুন আমার দেহে মনে সত্যিই আগুন জ্বলল; আমি বাবাকে বললাম -বাবা আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচতে দাও। বাবা বেতমারা কুকুরের মত ছুটে পালাল। একদিন নয় দশদিন বলেছি— শেষে একদিন পাথর ছুঁড়ে মেরেছি বাবাকে। কপালটা ফেটে গেছিল তার। সে রক্ত আমাকেই আবার ধুয়ে মুছোতে হয়েছিল। বাবা আমার অভাবে লোভে দুঃখে জানোয়ারের অধম হয়ে পড়েছিল। মা ছিল অদ্ভুত মানুষ। সব অদৃষ্ট বলে মেনে নিত। বোবা বোকা অদৃষ্টের খেলার পুতুল।

বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ছিল। তাকে প্রথমটা বলতে পারি নি। শেষে তাকে ধরলাম। স্বামীকে বললাম—তুমি বাঁচাও। বাবা আমাকে বেচেছে—তুমি আমাকে ওর হাত থেকে খালাস করো।

চাঁপা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীরবে 'না' বলার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লে। জানালে, 'পারলে না' বা 'করলে না খালাস', অথবা 'হল না'।

বললে—এরা না সেই স্বামী না সেই পুরুষ। কীচকের হাত থেকে দ্রৌপদীকে ভীম রক্ষা করেছিলেন কীচককে মেরে। আমি আমার স্বামীর পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম, বলেছিলাম—তুমি বাঁচাও। কিন্তু আমার—; কি বলব?

প্রশ্ন করে মেয়েটি কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—বাবা আমাকে ছুঁড়ে নরককুণ্ডে ফেলে দিয়েছিল—আমার স্বামীর দিকে আমি হাত বাড়িয়ে ডাকলাম, বললাম—আমাকে বাঁচাও; সে আমাকে বাঁচাতে এসে বুকে একখানা পাথর চাপিয়ে একেবারে এই দুঃসহ পঙ্ককুণ্ডটার পাঁকগোলা জলের তলায় পাঁকের উপর শুইয়ে দিয়ে গেল। আজও সেই সেইখানেই শুয়ে আছি আজ ষোল বছরের উপর। আশ্চর্য, মরি নি। মরণ তো এমনি এতে হয় না মরতে হয়—কিন্তু সে মরতে আমি পারি নি। এর জন্যে এত ঘেন্না নিজেকে করি যে কি বলব আপনাকে। একটু চুপ করে থেকে সে বললে—আমার বাবাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। আপনাকে কত বলব কলঙ্কের কথা লজ্জার কথা ঘেন্নার কথা; বাবার কলঙ্ককথা বলে শেষ হয় না—বাবা মদ খেতো, চরিত্রহীন ছিল—তার সঙ্গে দেশ দেশ করত—গরীবকে দেওয়ার নামে টাকা উড়িয়ে

বড়লোকগিরি করত। এই তো সব নয়; আমাকে বেচার আগেই বাবা আমার মাকে পাঠিয়েছিল চাটুজ্জেবাড়ি; সেখানে চাটুজ্জেবাড়ির বড়ছেলে মায়ের সর্বনাশ করেছিল। ছেলের মৃত্যুর পর চাটুজ্জে গিন্নী জানতে পারে ঘটনাটা। তার থেকেই চাকরি দিয়েছিল মাকে। তার পূজোর ঘর ঠাকুরের আসন পরিষ্কার করাতো। শুধু পেটের ভাতটা তাতে হতো। তার বেশী কিছু না। সংসারে অন্নের জন্যে মানুষ কি যে না পারে, না করে তা জানি না আমি। নিজেকে বেচেছি আবার মায়ের চাকরিটা তাও নিয়েছি। মায়ের পর আমি নিয়েছিলাম সে কাজ। নিত্য যেতাম সকালে আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে সে আপনি দেখেছেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুধাংশুবাবু।

মনে হল কথাটা ইঙ্গিতে নিত্যবাবু যেন বলেছিলেন।

চাঁপা বললে --কিন্তু বাবার থেকেও আমি বেশী ঘৃণা করেছিলাম আমার স্বামীকে। সে আমার স্বামী। আপনি বিশ্বাস করুন ব্যভিচারে আমার প্রবৃত্তি ছিল না, অলংকার আভরণ সাজসজ্জা এতেও আমার লোভ ছিল না, আমার রূপ ছিল, তখন আমার সদ্য-যৌবন, নতুন জোওয়ান—সেও তখন নবযৌবনে, নারীর উপর তার লোভ ছিল—কিন্তু সে ওই রাক্ষসটার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারে নি। দুজনে আমরা পরামর্শ করেছিলাম—তাকে আমি তাতিয়েছিলাম, বলেছিলাম—তুমি ওকে খুন কর। ছোরা কিনবার টাকা তাকে আমি দিয়েছিলাম। ছোরা কিনেও সে এনেছিল। গিয়েও সে ছিল। কিন্তু খুন করে প্রাণ নেওয়ার বদলে সে টাকা নিয়ে ফিরে এসেছিল চোরের মত। কম টাকা নয়—তাকেও দু'হাজার টাকা দিয়ে বলেছিল—ব্যবসা কর। আরও সাহায্য করব আমি। কি হয়েছিল শুনুন।

আমার স্বামীর নাম প্রণব চক্রবর্তী। অবিকল নীলু।

একটু হেসে চাঁপা বললে—ভুল বলছি—নীলু অবিকল তার মত। ওই গায়ের রঙ ওই কটা গৌরবর্ণ কটাসে চুল, ওই খয়রা কটা চোখের তারা, ওই মুখ ওই সব।

থেমে গেল চাঁপা। হঠাৎ যেন তার ভেতর থেকে কেউ বা কিছু তাকে থামিয়ে দিলে। থমথম করে উঠল তার মুখ।

চাঁপা বলেছিল তার রূপ ছিল।

মিথ্যে বলে নি। তা ছিল। কিন্তু সে রূপের উপর বিচিত্রভাবে কিছুর যেন ছায়া পড়েছে। একটা গ্লানির আস্তরণ পড়েছে। সেই আস্তরণ ভেদ করে বিদ্যুচ্চমকের মত কিছু খেলে গেল। সেটা হয় ক্ষোভ নয় ক্রোধ অথবা একটা নিদারুণ কোন আক্ষেপ।

তারপর বললে—তার সঙ্গে নীলুর চেহারার এত মিল বলেই নীলুকে আমি তার জন্মকাল থেকে চোখে পাড়ি নি। তাকে ঘেন্না করে এসেছি—তার মৃত্যু কামনা করেছি। মায়ের কাছে ছেলের যা পাওনা তার, বলতে গেলে, কিছুই দিই নি। অহরহ কেমনভাবে মর মর বলে তাকে অভিসম্পাত দিয়েছি সে আপনি নিজে জানেন। কাছে আসতে চাইলে কিভাবে তাকে কুকুর বেড়ালের মত আঘাত করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছি তাও আপনি দেখেছেন।

নীলুর কপালে নাকে মাথায় পাঁচ-ছ'টা কাটার দাগ আছে। তার মধ্যে আমার নিজের হাতের আঘাত আছে তিন-চারটে। বাকি দু'তিনটে সেও আমারই অবহেলায় অথবা ঠেলায় কি হাতের ঝটকায় পড়ে গিয়ে কেটে গিয়ে দাগ রেখে গেছে। কত আঘাতের কত চিহ্ন যে নীলু আপন সহগুণে নিজেই মুছে ফেলেছে তার আর হিসেব নেই।

সুধাংশুবাবু বললেন—তুমি যা বলছিলে তাই বল। তোমার স্বামীকে তুমি সমস্ত বলেছিলে এবং দুজনে ঠিক করেছিলে যে, ওই মল্লিককে সে মানে প্রণব খুন করবে, কিন্তু সে তাকে খুন করতে গিয়ে আরও দু'হাজার টাকা নিয়ে ফিরে এসেছিল। বল কি হয়েছিল। তার আগে দাঁড়াও, কতদিন আগের ঘটনা? যেদিন তোমার বাবা তোমাকে বেচে দু'হাজার টাকা নিয়ে এসেছিল, তার কতদিন পর? হ্যাঁ। বিয়ের কতদিন পর এ ঘটনা ঘটেছিল? মানে তোমার বাবা তোমাকে এমনভাবে বেচেছিল? যখন বিক্রি করে তখনই বা সে কোথায় ছিল? মানে তোমার স্বামী? দেশ কোথায় ছিল তার? তাদের অবস্থাই বা কেমন ছিল? সংসারে স্ত্রী কন্যা ভগ্নী বিক্রির হাজার লক্ষ কোটি নজীর আছে কিন্তু তার পিছনেও থাকে নানান কারণ। মদ মানুষ খায়, নেশার লোভেও খায়, নিদারুণ শোকেও খায়, আবার ডাকাতি খুন করবার আগেও খায়।

মা-বাপ নেই, কলেজে পড়ে এমনি দেখেই বাবা আমার স্বামীকে পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিল। সে নাকি লেখাপড়ায় ভাল ছিল। ইচ্ছে ছিল, আমি তার এক মেয়ে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরে রাখবে; জামাই ছেলের মতই তার সব দেখবে—ঘরসংসার কারখানা চালাবে।

কারখানা তখনও চলছিল। তখনও বাবা বুঝতে পারে নি যে ভিতরে ভিতরে সর্বনাশ তার হয়ে গেছে।

চৌদ্দ বছরে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমার স্বামী তখন আই-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছে। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের তিন মাস পরে রেজাল্ট বের হল। খুব ভাল করে পাস করেছিল জামাই। বাবা তাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল। থাকত হোস্টেলে। রবিবারে ছুটিতে আসত, থাকত, চলে যেত। এক বছরের মধ্যে সব উলটে গেল পালটে গেল; ওই বিয়াল্লিশের ঝড়ে যেমন সারা দেশটা ভেসে গিছল উড়ে গিছল তছনছ হয়ে গিছল তেমনি-ভাবে আমাদের সংসার অবস্থা সব ভিতধ্বসা বাড়ির মত ভেঙে পড়েছিল—মাথার উপরের চাল উড়ে যাওয়ার মত উড়ে গিয়েছিল।

তবে বিয়াল্লিশ সালে নয়, দু'বছর পরে বাবার উপর ঝড়টা এল—১৯৪৪ সালে হঠাৎ একদিন বডি ওয়ারেণ্ট এসে হাজির হল। আদালতের লোক পুলিস বাবার নামে বডি ওয়ারেণ্ট দেখিয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলল। ওদিকে কারখানাতেও তালা চাবি দিয়ে সীল করে পাহারাওলা বসিয়ে দিয়েছে। বাবা কোনরকমে একশো টাকা ঘুষ দিয়ে বেরিয়ে পালাল।

সে অনেক কথা।

গহনাগাঁটি বিক্রি করে টাকা দেওয়া হল। বাড়ি বন্ধক পড়ল চাটুজ্জেদের কাছে। মা অনেক

সেবা করে এল চাটুজ্জেদের ঠাকুরের চাটুজ্জেদের বুড়ো কর্তার ; কিন্তু দায় তাতেও মিটল না। অবশেষে বাবা একদিন আমাকে বেচলে। ১৯৪৪ সালে।

আমি সর্বাঙ্গে একটা জ্বালা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। তিন দিন খাই নি। উপোস করে পড়ে ছিলাম। মা পুতুলের মত মাথার কাছে বসে ছিল। বাবা থিয়েটারে অ্যাকটিং করে যারা শোক করে, তাদের মত বুক চাপড়ে হায় হায় করলে। তিন দিন পর মল্লিকই এল, এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

সেদিন সে রাজ্যের জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। গহনা শাড়ি ব্লাউজ খাবারদাবার—সে যেন একটা নতুন বিয়ের পরের তত্ত্বতল্লাশী ভারভারোটা। সেন্ট পাউডার স্নো সাবান—সে থরে থরে সাজানো জিনিস।

ইচ্ছে হয়েছিল পায়ের লাথি মেরে সব ছুঁড়ে ফেলে দি—ভেঙে চুরমার হয়ে যাক। কিন্তু পারি নি। কেন শুনুন !

লোকটা আমার সামনে দাঁড়াবামাত্র আমার ভয়ের আর শেষ ছিল না। বুকের ভিতরটা যেন কাঁপছিল। মনে পড়ে গেল দু'হাজার টাকা সে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল। বাবা টাকাটা আমার হাত থেকে নিয়ে আমাকে তার কাছে রেখে চলে গিয়েছিল বেরিয়ে।

লোকটা আমাকে ভোগ করেছিল বুভুক্ষুর মত। রাক্ষসের মত। আমার চেতনা ছিল না—আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সে আমাকে গাড়ি করে এনে ওই আমাদের গলির মোড়ে, যে মোড় দিয়ে আপনি সেদিন ঢুকে পড়েছিলেন, যে মোড়ের মাথায় মল্লিক খুন হয়েছে সেই মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। মোড়ে বাবা দাঁড়িয়ে ছিল, আমার হাত ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ছে লোকটা আমাকে বলেছিল—তোমার বাবা তোমাকে বেচেছেন আমাকে। তুমি এখন আমার।

তখন আমার বয়স ষোল তো পৌঁছয় নি। আমি বোবার মত শুধু শুনেইছিলাম। এ কাল হলে হয়তো বলতে পারতাম, বলতাম মানুষ টাকায় বিক্রি হয় না। মানুষ কেনা-বেচার কাল চলে গেছে। কিন্তু সেকালে সে বোধও জন্মায় নি সাহস তো হয়ই নি।

তাই তিন দিন উপোস করে আছি যখন তখন সেই লোক, যে লোক সেদিন দু'হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে আমার অবশ বিবশ অসাড় দেহখানাকে ছিনিমিনি খেলার নজীর মনে পড়িয়ে দিয়ে আমাকে কিনেছে বলে মুখের কথার দলিল আমার সামনে ধরলে, তখন আমার মনে হল আমার বুঝি উপোস করে কি বিষ খেয়ে মরারও অধিকার নেই। লোকটা বোবা আমাকে দিয়ে যে মৌন সম্মতির সই বা টিপটাপ দিয়ে নিয়েছে তা আমার অস্বীকার করবার সব জোর একমুহূর্তে হারিয়ে গেল।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কেঁপে উঠলাম।

'—একটু জল দেবেন, আমি একটু জল খাব।'

চাঁপা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে কথা ক'টি বললে।

সুধাংশুবাবু একেবারে যেন আচ্ছন্নের মত বসে শুনছিলেন। চাঁপা চুপ করতেই এবং কথা কয়টার অর্থ তাঁকে বাস্তবে এই ১৯৬০ সালের জুলাই অর্থাৎ শ্রাবণের রিমিঝিমি বর্ষণে ভিজে ভিজে এই রাত্রির অস্তিত্বে সচেতন করে তুললে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দেওয়ালের ক্লক ঘড়িটার পেণ্ডুলামের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

চাঁপার মুখখানার উপর তাঁর দৃষ্টিও এতক্ষণে সচেতন হল। সত্যই চাঁপার একদা রূপ ছিল। আজও আছে—নেই তা নয়। তবে আজকের রূপ বাসী ফুলের মত। গন্ধেও তার সেই এক পরিচয়। বিকৃত এবং বাসী। চাঁপার মুখের উপর চোখের কোল থেকে চিবুক পর্যন্ত দুটো দাগ আলোর ছটায় চকচক করছে। যতক্ষণ এই কথা সে বলছে ততক্ষণ সে নিরন্তর আত্মসংবরণের চেষ্টা করে ধীরে ধীরে কথা বলেছে এবং এরই মধ্যে-মাঝে কেঁদেও চলেছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছে, গড়িয়ে ঝরে পড়েছে, চাঁপা তা মুছতে চেষ্টা করে নি; হয়তো তাঁর মতই তারও এ সম্পর্কে কোন সচেতনতা ছিল না।

তিনি একদিকে শুনেছিলেন অন্যদিকে তিনি বিচার করছিলেন মেয়েটির কথার সত্যাসত্য।

মেয়েটি?

মেয়েটি অকপট সত্য বলে যাচ্ছিল তার সাক্ষী ওই দুটি জলধারার চিহ্ন। সেও নিজেকে বিচার করে কথা বলছিল।

সুধাংশুবাবুর টেবিলের উপর পুঁতির ঝালর দেওয়া নেটের ঢাকনি ঢাকা কাচের গ্লাসে জল ছিল, গ্লাসটি তিনি নিজের হাতে তুলে বাড়িয়ে ধরলেন।

—খাও।

মেয়েটি বললে—এই গ্লাসে খাব?

—খাবে।

কিন্তু মেয়েটি তা খেলে না, গ্লাসটি হাতে নিয়ে বাইরে গিয়ে গ্লাসটা উঁচু করে ধরে মুখ তুলে আলগোছে ঢেলে জল খেয়ে নিলে, তারপর খসে পড়া ঘোমটাটি আবার মাথা ঢেকে বিন্যস্ত করে নিয়ে এসে সামনে বসল। জলের গ্লাসটি টেবিলের তলায় রেখে দিলে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে সুধাংশুবাবু চুপ করে বসে ছিলেন। তাঁর কাছে এই মুহূর্তে সব হারিয়ে গেছে। চোখে কিছু দেখছেন না—মনে কিছু ভাবছেন না। কানের কাছে শুধু শেষ কথা কয়টা ধ্বনিত হচ্ছে এবং এই হতভাগিনী মেয়েটার বলা কাহিনী, যে-পর্যন্ত সে বলেছে, তারই প্রভাব তাঁর চেতনা ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সামনে বারান্দার বাইরে পথের উপর বর্ষার রাত্রি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধ্যরাত্রির দিকে এগিয়ে চলেছে; রাস্তায় ইলেকট্রিক আলোর পোস্টে বাল্‌ব নেই, কেউ চুরি করেছে অথবা মিউনিসিপ্যালিটির যারা আলো দেয় তারাই ওটা দেয় নি। পরের পোস্টটার আলো থেকে একটু আলোর আভাস অন্ধকার শূন্য-মণ্ডলে জেগে রয়েছে, তাঁর ঘরের ভিতরের কিছুটা আলো বারান্দা পার হয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মিশেছে, সেই সংযোগস্থলের আভাসিত শূন্যমণ্ডলে দেখা যাচ্ছে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে।

রাস্তা নির্জন হয়ে গেছে। তিনি প্রতীক্ষা করে রয়েছেন চাঁপা মেয়েটির কথা শুনবার জন্য।

১৯৪২।৪৩।৪৪ সালের কথা মনে পড়ছে।

১৯৪২ সালে তিনি নতুন উকিল। মনে পড়ছে সে সময়কার কথা। ১৯৪৩ সালের পূজা সাহিত্যে লেখাগুলো আজও বেঁচে আছে। মন্বন্তর উপন্যাসের গীতা বলে মেয়েটির ঠিক এই কথা। প্রবোধ সান্যালের অঙ্গার গল্পের সেই কটি মেয়ের বিলাপের মত সকরুণ আক্ষেপের সঙ্গে চাঁপার এই কথাগুলির এতটুকু গরমিল নেই। সেই সময়ের বাংলাদেশের এই সব হতভাগিনী-দের মর্মান্তিক বিলাপ এবং সহস্রমুণ্ড রাবণের মত কালোবাজারী অর্থশক্তিতে বলীয়ান মানুষের সে অত্যাচার নিষ্ঠুরতম সত্য বলেই, এই মুহূর্তে সুধাংশুবাবুর মনে পড়ছে। চিত্রায় জয়নাল আবেদিন সাহেবের কালো কালিতে আঁকা ছবিগুলো মনে পডছে। শুধু সাহিত্য শিল্প কেন, তাঁর নিজের ওকালতির ইতিহাসে তাঁর সেরেস্তায় খাতার পাতায় পাতায় এমনি ছোট বড কেসের কথা আছে।

চাঁপা মিথ্যা বলে নি। তার কাহিনীর সত্য ইতিহাসের পাতা খুলে দিয়েছে।

মনে পডল গ্রামাঞ্চল থেকে যারা বেরিয়েছিল পেটের জ্বালায় তাদের যারা মরেছে তারা বেঁচেছে—যারা আছে যাদের যৌবন ছিল রূপ ছিল তারা আর ফেরে নি। এবং সেই যে সেদিন যুদ্ধের দ্যূতসভায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করেছিল তার পালা আজও শেষ হয় নি।

চাঁপা এবার কথা বললে—এবার শুরু করলে সে।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুধাংশুবাবু। তার চিন্তার প্রবহমানতা খণ্ডিত হল। ছেদ পডল।

চাঁপা বললে—যতবার চেষ্টা করেছি সাহস আনতে চেয়েছি বুকের মধ্যে ততবার যেমনি ওই লোকটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অমনি ভেঙে বসে পডেছি। মনের সাহস চলে গেছে দেহের শক্তি চলে গেছে—আমি যেন হয়ে পডেছি সাপের মুখে ধরা পডা ব্যাঙের মত। আমাদের গলিটার নর্দমায় একটা খুব মোটা জলঢোঁড়া সাপ আছে—সেটা রোজই প্রায় ব্যাঙটাকে কামড়ে ধরে মাথা উঁচু করে চলে যায় আমাদেরই উঠোনের মাঝখান দিয়ে। উঠোনের কোণে জঙ্গলের মধ্যে তার একটা গর্ত আছে। সেখানে গিয়ে সেটাকে নির্বিবাদে গেলে। আমি দেখেছি তার গেলা। ব্যাঙটা যদি বা কাতরায় কিন্তু হাত পা ছোঁড়ার বাধা দেবার শক্তি তার থাকে না। মধ্যে মধ্যে কোন একটা পা হয়তো থরথর করে কাঁপে।

হেসে চাঁপা বলে—জানেন লোকে বলে, মায়ের কাছে শুনেছি,—মা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বলে সাপে যখন ব্যাঙ ধরে তখন ব্যাঙটা যে কঁ্যা-কঁ্যা শব্দে কাতরায় তাতে বলে—কড়ি নে। কড়ি নে। তার মানে হল সাপটা হল গত জন্মের পাওনাদার আর ব্যাঙটা হল ওই গত জন্মেরই দেনাদার। পাওনাদারের দেনা দেয় নি। তাই এ জন্মে পাওনাদার হয়েছে সাপ ও হয়েছে ব্যাঙ! থাক। এখন যা ঘটেছিল বলি শুনুন। আমার স্বামীর কথা।

মাস চারেক পর একদিন এই লোকটাই শ্রীরঙ্গম থিয়েটারের টিকিট কিনে আনলে। আমার

স্বামী তখনও কিছু জানে না। সে তখনও হোস্টেলে থাকে। খরচ ওই মল্লিকই দিত। প্রীরঙ্গমে সেদিন হচ্ছিল 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। শিশিরকুমার ভাদুড়ী করবেন 'ভীম'।

—কোথা থেকে যে কি হয়! কি থেকে যে মানুষ কি পায়! সে এক আশ্চর্য হাসি হাসলে চাপা। হেসে বললে—দ্রৌপদী ভীমকে কীচকের কথা বললে ভীম তাকে আশ্বাস দিলে—তারপর কীচককে বধ করলে। আমার বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠল। মনে হল এই তো আমি উপায় পেয়েছি। যুধিষ্ঠিরের উপর ঘেন্না হল—অর্জুনকে বলতে ইচ্ছে হল তুমি ওই বৃহন্নলা হয়েই থাক আজীবন!

• একটু থেমে সে বললে—আজও আমি ভীমের ভক্ত। মহাভারতে আমার কাছে ভীমের চেয়ে বড় বীর নেই—বড় মানুষ নেই।

—মনে আছে সপ্তাহের মাঝখানে বৃহস্পতিবারে পাণ্ডবগৌরব দেখতে গিয়েছিলাম। শুক্রবার তাকে চিঠি লিখলাম—নিশ্চয়ই আসবে কাল। না এলে আমাকে আর বেঁচে থাকতে দেখতে পাবে না। কিন্তু শনিবার সে এল না, এল পরের দিন রবিবার। শনিবার কোথায় গিছল। চিঠি পৌঁচেছিল সন্ধ্যের ডাকে। তখন আর হোস্টেল থেকে আসবার উপায় ছিল না। শনিবার রবিবার লোকটার ডাক আসত না। ও দু'দিন তার অন্য আড্ডা ছিল। সে সব নাকি নাচগানের আসর।

সারাদিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে চিঠি লিখে তার হাতে দিয়ে বললাম—পড়ে দেখ।

চিঠিতে লিখেছিলাম—যদি আমাকে মরতে বল তবে তুমিই আমাকে মার, খুন কর। নয়তো বিষ এনে দাও—তুমি গুলে তুলে দাও আমি খাই—নয়তো মহাভারতের ভীমের মত তুমি ওকে খুন করে আমাকে বাঁচাও।

সারারাত সেও বোবা হয়ে বসে রইল আমিও বোবা হয়ে বসে রইলাম। যখন রাত্রি শেষ হয়ে এল—ক্লক ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে চারটে বাজল তখন আর আমি থাকতে পারলাম না, লজ্জায় সব বাধাবন্ধন টেনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার দুটো পা জড়িয়ে ধরে বললাম—বল আমি কি করব। কে আমাকে বাঁচাবে? আমি কি এমনি করেই মরব জ্বলব আজীবন?

সে আমাকে—।

একটু থেমে আবার বললে—দু'হাতে সমাদর করে বুকে তুলে নিয়েছিল। ভরসা দিয়ে বলেছিল—কোন ভয় নেই। এ বাঁচানোর দায় আমার। আমিই বাঁচাব তোমাকে।

আমি বলেছিলাম—আমাকে ঘেন্না করছ না তুমি?

—না। তারপর খুব জোর করে বলেছিল—আমি একালের মানুষ রত্না। একটু থেমে মেয়েটি বললে—জীবনে কতকগুলো কথা মনে থেকে যায় কাটা দাগের মত। সে রাত্রের কথা আমার তেমনি যেন কাটা দাগ হয়ে বসে আছে। অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। সারারাত্রি দুজনে বোবার মত পড়ে থাকার পর ভোরবেলা এসব কথা হয়েছিল। ভোরবেলাতে সে হঠাৎ

আমাকে সমাদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। সোমবার সকালে উঠেও সে চলে যায় নি। সারাদিন শুধু এই নিয়েই কথা বলেছিল। অনেক কবিতা মুখস্থ ছিল তার। সত্যকাম জাবাল আর তার মা জাবালাকে নিয়ে কবিতা শুনিয়েছিল আমাকে। মহাভারতের অহল্যার গল্প বলেছিল। আর গল্প বলেছিল কলেজে পড়া নেপালী ছেলে 'খড়্গবাহাদুরের' কথা। খড়্গ-বাহাদুর নেপালী মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করবার জন্য—তাদের যুবতী মেয়ে কেনার গোপন ব্যবসা বন্ধ করবার জন্য একজন ধনী ব্যবসাদারকে খুন করে গিয়ে থানায় ধরা দিয়ে বলেছিল—আমাকে ফাঁসি দাও। আমার স্বামী বলেছিল—তুমি আমার স্ত্রী—তোমাকে কিনে তোমাকে যে শয়তান ভোগ করেছে তাকে খুন করে আমি গিয়ে বলব—দাও আমাকে ফাঁসি দাও!

সারাটা দিন নানান জল্পনা করেছিলাম।

সোমবার রাত্রিতেও সে আমাদের বাড়িতে ছিল। বিকেলে আমার কাছে টাকা নিয়ে কলকাতায় গিয়ে ছোরা কিনে নিয়ে ফিরে এসেছিল। সেটা একটা শ্রিং-দেওয়া ছোরা। অনেকখানি লম্বা। ডগাটা ছুঁচলো আর ডগার দিকটার দু'দিকেই ধারালো। পরামর্শ করে ঠিক হয়েছিল পরের বৃহস্পতিবার আবার থিয়েটার দেখতে যাব। বাবাকে বলব—বাবা তাকে বলবে। এদিন তার সঙ্গে একলা যাব। সে তাতে খুশীই হবে। থিয়েটার শেষে সে আমাকে নামিয়ে দিতে আসবে এখানে। ওই গলির মোড়ে নামিয়ে দিলে আমি বলব আমাকে একটু দাঁড়িয়ে যাও। বাবা যদি থাকে দাঁড়িয়ে তাহলেও তাকে ডাকব। সে ছোরা নিয়ে গলিতে অপেক্ষা করে থাকবে। গলিতে ঢুকবামাত্র সে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দেবে।

তারপর কি হবে তা ভাবি নি। কি হবে এ চিন্তা আসে নি। শুধু এই মহাপাপ এই নরকের জ্বালা এই নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাব এইটেই মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিল। দেশে তখন আকাশের বাতাসের মধ্যে দিয়ে তুফান বয়ে গেছে, দুর্ভিক্ষের জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে, যারা অভাবী, যারা মরছে, যারা ডুবছে, যাদের বাড়িঘর মানসম্ভ্রম সর্বস্ব হারাচ্ছে তারা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চাচ্ছে—তাতে যা হয় হোক। আমরা দুজনে সদ্য বিয়ে হওয়া ছেলে এবং মেয়ে—তার বয়স সবে উনিশ, আমার বয়স ষোলতে আমি পা দিয়েছি—আমাদের দুজনেরই বুকে জ্বলছে আগুন। কি হবে তা ভাবি নি, ভাবতে চাই নি, সে ভাবনা মনে আসে নি। তবু মোটামুটি ঠিক হয়েছিল খুন করে সে পালাবে। প্রথম আমি বলব একটা গুণ্ডা লোক তাকে খুন করে পালিয়েছে—আমার গলার হার ছিঁড়ে ফেলে দেব গলির উপর। বলব —আমার হার ছিঁড়ে নিচ্ছিল দেখে সে তাকে বাধা দিয়েছিল, গুণ্ডাটা তাকে ছুরি মেরে পালিয়েছে।

আর ধরাই যদি পড়ি তাহলে আমি বলব সত্য কথা।

সেও বলবে—আমার স্ত্রীর সতীত্ব যে নষ্ট করেছে—যে শয়তান আমার স্ত্রীকে টাকার জোরে হরণ করেছে তাকে আমি খুন করেছি। রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল—রাম তাকে বধ করে-ছিলেন। আমিও আমার স্ত্রীর সতীত্বহরণকারীকে বধ করেছি।

সে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল।

আমিও পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস দেখে এসেছিলাম—ঠিক যেন দ্রৌপদীর উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। সারা রাত্রি সারা দিন ঘুম হয় নি। কিন্তু—

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে চাঁপা। এবং চুপ করে গেল কিছুক্ষণের জন্য। মুখের উপর চোখের জলের দাগ দুটো আবার চিকচিক করে উঠল। এরই মধ্যে একটু আশ্চর্য হাসি হেসে চাঁপা বার দুয়েক 'না'-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললে—হয় আমার কপাল, নয়তো নিতান্তই কাঁচা কাজ হয়েছিল। খুন করা যে কতটা কঠিন তা বুঝি নি। কিংবা—।

চুপ করে গেল চাঁপা।

একটু চুপ করে থেকে বললে—হয়তো সেই ছিল নিজে অত্যন্ত ভীরু! অত্যন্ত ভীরু। আমার চোখের সামনে নীলু তো তাকে মারলে। ঠিক যেমন করে মারবার কল্পনা করেছিলাম—যেখানটায় মারবার কথা হয়েছিল ঠিক সেইখানটায় নীলু তার পেটে বুকে ছুরি মারলে—পড়ে গেলে মুখে লাথি মারলে।

আবার চুপ করে গেল।

সুধাংশুবাবু বললেন—তুমি সেই দিনের কথা বল। থিয়েটার থেকে ফেরার পথে তোমার স্বামী কি করলে? ভয়ে পালিয়ে গেল?

—না। ছুরি তুললে। কিন্তু মল্লিক খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলল। হাতখানা তার আগে থেকেই কাঁপছিল এবার ধরার সঙ্গে সঙ্গে ছুরিখানা খসে মাটিতে পড়ে গেল। ঠিক গলির মোড়ে গ্যাস পোস্টটার নিচে। আমি দেখলাম মুখখানা সাদা হয়ে গেছে তার। বাবা চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল—প্রণব! প্রণব হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল।—ছেড়ে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন। আমি চলে যাব। আর কখনও আসব না।—ও--ও—আমাকে—। আর আমি শুনি নি। ভয় বোধ হয় আমিও পেয়েছিলাম। আমিও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিছলাম।

সেই দিন রাত্রে আমি আবার বিক্রি হলাম।

এর আগেকার বিক্রি করেছিল বাবা। এবার প্রাণের দায়ে বিক্রি করলে স্বামী। তার সঙ্গে আমি নিজে বিক্রি করলাম নিজেকে।

আমাদের বাড়িতে আমারই শোবার ঘরে বসে নিজের হাতে আমার স্বামী লিখলে—সে এবং আমি ষড়যন্ত্র করে আমার রূপ-যৌবনের লোভ দেখিয়ে এ বাড়িতে এনে তাকে খুন করার প্ল্যান করেছিলাম। তাতে সই করিয়ে নিলে আমার স্বামীর, আমার; সাক্ষী রইল আমার বাবা আর তার ড্রাইভার।

আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিয়ে গেল নগদ দু'হাজার টাকা। বললে—এসব কুরো না। লাভ হবে না। টাকা নিয়ে ব্যবসা করো। আমার অধীনে সাবকণ্ট্রাক্ট তোমাকে দেব আমি। এভাবে বদ মতলব করো না। আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে গরীব লোকেরা ছোট জাতের বাঁ হাতের

বুড়ো আঙুলের নখে রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে টিপে উকুন মারে। তেমনি ভাবে নখের চাপে মরে যাবে।

হেসে বললে। তোমার বউ তোমারই থাকবে। থাকল। আমরা একটু-আধটু আনন্দ করব চলে যাব। এর জন্যে এত ফোঁসফোঁসানি কেন হে?

সে রাত্রে সারারাত সে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। মড়ার মত। নড়লে না কথা বললে না। আমিও উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম। আমি কাঁদলাম সারারাত। সে খাটের উপর আমি মেঝের উপর মুখ গুঁজে।

সকালবেলা সে উঠে কোন কথা না বলে চলে গেল। আমি দেখেও দেখলাম না। বাবাও বোবা হয়ে যাওয়া দেখলে। মা কাঁদলে আর দেখলে। বলতে কিচ্ছু পারলে না।

সেও বেরিয়ে গেল ঘাড় হেঁট করে। এ কথাও বলতে পারলে না যে তোমাদের মেয়ে রইল আর আমি আসব না।

এক মাস আর এল না। বাবা যেতেও পারলে না তার হোস্টেলে। বাবা পারলে না লজ্জায়। আমাকে মা বললে—চিঠি লেখ। কিন্তু আমি লিখলাম না। আমার লজ্জা হল না, ঘেন্না হল।

ঘেন্না তখন জন্মেছে। একতলা থেকে দোতলার মত ভারী ইমারত হয়ে গড়ে উঠেছে। ঘেন্নার একতলাটা ওর ভীরুতার জন্য। ওর সেই হাউ হাউ কান্নার জন্য। ও যে বলেছিল, আমাকে ছেড়ে দিন আমি চলে যাব—কখনও আসব না।—তার জন্য। ওর ওপর দোতলা ইমারত গড়ে উঠল তার পরের দিন, ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। দু'হাজার টাকা যেটা মল্লিক ওকে দিয়েছিল গতরাত্রে সেটা ও নিয়ে গেল সঙ্গে করে—এই খবরটা ফাঁস হবামাত্র একতলা ঘেন্নার ইমারত দোতলা হয়ে উঠল। সেটা তিনতলা হয়ে উঠল আরও এক মাস পর। আমাদের বাড়িতে নির্লজ্জ লোকটা পাকাপাকি বাস করতে এল। মল্লিকই ব্যবস্থা করে দিলে। বললে, পড়ে কি হবে। আমার আণ্ডারে সাবকণ্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করুক।

আমার মধ্যে তখন নীলু এসেছে। বুঝতে শুরু করেছি তার সাড়া। সারা শরীর মন ঘেন্নায় ঘিনঘিন করে উঠেছিল—রাগে মন হয়ে উঠেছিল তপ্ত কড়াইয়ের মত; কেউ কিছু বললে তাকে উত্তাপে ঝলসে দিতাম—নিজে জ্বলতাম—দেহে যেন মনে হত কেউ লঙ্কা বেঁটে মাখিয়ে দিয়েছে।

বার বার প্রতিদিন মনে মনে বলেছি ছেলেটা যেন গর্ভেই মরে যায়—ওকে পেটে নিয়েই আমি মরি। কিংবা ভূমিষ্ঠ হতে হতে মরে যায়। কার ছেলের মা হব আমি? ওই রাক্ষস মল্লিকের? না এই অক্ষম ভীরু অপদার্থ আমার ওই স্বামী ওই গোলামটার? হায় হায় হায়, ছ'মাস পর নীলু জন্মালো—তখন ওর বাবা মরেছে আমার বাবা মরেছে। ছেলেটা জন্মের মুহূর্ত থেকে অবিকল বাপের মত দেখতে। কটা চুল কটাসে রঙ চোখ দুটো তখন খয়রা রঙের ছিল না নীল রঙের ছিল।

মুখের দিকে তাকিয়ে আমার আর ঘেন্নার আক্রোশের অন্ত রইল না।

বাপ আর স্বামী মরবার পর মল্লিক আমাকে বলেছিল—আমি বাড়ি ভাড়া করি তুমি সেখানে গিয়ে থাকবে চল। কেন এখানে কষ্ট করবে!

আমি তা যাই নি।

আমাকে সে সুখ সম্পদ দিতে চেয়েছে—আমার তা পছন্দ হয় নি। তার উপর আমার সে ঘেন্না কোন দিন যায় নি। তাকে আমি ভয় করতাম। সে আমাকে কিনেছিল। আমার আর আমার স্বামীর সই করা একখানা কাগজ তার কাছে ছিল। স্বামীর সই করা টাকা ধারের দলিল সে বছর বছর আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে।

আমি এতটুকু মিথ্যে বলি নি বাড়িয়ে বলি নি। বিশ্বাস করতে হয় করবেন নইলে করবেন না। আমি পাপিনী এ কথা কেউ না-জানা নয়। পাপের কোন সাফাই নেই, সে সাফাই আমি গাইছি না। শুধু এইটুকু বিশ্বাস করুন যে, সারা সংসারের উপর আমার ঘেন্না। ঈশ্বরের উপর ঘেন্না—মানুষের উপর ঘেন্না—নিজের উপর ঘেন্না—মা বাপের উপর ঘেন্না—মল্লিক আমার শত্রু কিন্তু সব থেকে বেশী ঘেন্না আমার ওই অক্ষম ভীরু কাপুরুষ স্বামীর উপর। তার ছেলে বলে নীলুকে আমি জন্মদিন থেকে ঘেন্না করে এসেছি। একটা কথা বলি—জন্মের পর কতদিন কতবার যে মনে মনে চেয়েছি—মরে যাক ওটা মরে যাক আমার আপদ যাক। কতদিন ভেবেছি ছেলেটার মুখের উপর একটা বালিশ চাপিয়ে কিছু ভার চাপিয়ে দি। কিন্তু পারি নি আমার মায়ের জন্যে—আর পারি নি ওই মল্লিক লোকটার জন্যে। কেন জানি না সে এর বিরোধী ছিল। বলত—মহাপাপ। আমার সর্বনাশ করে তার পাপ হয় নি কিন্তু ছেলেটাকে মেরে ফেললে মহাপাপ হবে এ কথা যে কতদিন বলেছে তার ঠিক নেই। বলত—খবরদার! খবরদার! মহাপাপ হবে। এ যেন কখনও করো না।

চুপ করে গেল চাঁপা।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বেশ কিছুক্ষণ। বাড়ির ভিতর থেকে তাগিদ এল। সুধাংশু-বাবু বললেন—মক্কেলের কথা শুনছি। দেরি হবে।

বাইরে বৃষ্টিটা চেপে এল কিছুক্ষণের জন্য। সুধাংশুবাবু রত্নমালাকে ভাল করে দেখলেন। তার অবয়বের ভাঁজে ভাঁজে বিশেষ করে এলানো চুল বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে থাকার মধ্যেও যে-একটি ছাঁদ রয়েছে এবং চোখে ও মুখে যে-একটি কিছু রয়েছে তাতে সে প্রেতিনী। তিনি বারো বছর আগে তাকে দেখেছেন,—তারপর তার ইতিহাস শুনেছেন। তার ছেলে নীলু, তাকে তিন-চার বছরের শিশুকালে অবহেলা অবজ্ঞার মধ্যে ডেয়ো পিঁপড়ের কামড়ের যন্ত্রণায় কাঁদতে দেখেছেন। এই মায়ের সেদিনের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে বাজছে। "মর। মর। মরে যা আপদ মরে যা!" সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সকালবেলা চার-পাঁচ বছরের ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে চলেছে পিছনে পিছনে। মনে পড়ল সাত-আট বছরের ছেলেটা পা ঠুকতে ঠুকতে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলেছে। তার সঙ্গে বিচিত্র এক কান্না—আঁ! আঁ! আঁ! তার পরেই মনে পড়ল নিষ্ঠুর আক্রোশে ঢেলা ছুঁড়লে ঢেলাটা লাগল মায়ের হাঁটুতে মা পা ধরে বসে পড়ল। এসবের অর্থ যেন বদলে যাচ্ছে আজ! চাঁপা যেন তার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়া, হাহাকারভরা জীবনের আবরণ উন্মোচন করছে।

মন তাঁর এখনো প্রশ্ন করছে—এ সত্য ? যা বললে তা সত্য ?

তাঁর পেশা ওকালতী। ওকালতীর দেওয়ানী মামলা তিনি করেন না। ক্রিমিন্যাল কেস নিয়েই তাঁর ওকালতী। একসময় রাজনৈতিক দলের বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনে অভিযুক্ত কর্মী-দের স্বপক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ডাকাতি মামলায় অভিযুক্তদের খুনের মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করেছেন তিনি। এও খুনের মামলা। এর যে আসামী নীলু, সাধারণের মধ্যে তার যে পরিচয় তাতে সে এখানকার একজন বিখ্যাত মস্তান। তার এই মা —তার ইতিহাস সে স্বৈরিণী। সে নিষ্ঠুরা। তার সাক্ষী তিনি নিজে।

এ মামলা তিনি অর্থের জন্য নেবেন না।

একদিন একটি ক্ষুদ্র উপকার মেয়েটি করেছিল। হয়ত ক্ষুদ্র নয়—বৃহৎ। তাঁর প্রাণটা যেতে পারত সেদিন।

আর ওই মেয়েটি এতক্ষণ ধরে যা বললে—।

পুরাণের চরিত্রের মত পুণ্য চরিত্রবল ওর নাই। ও পতিতা। কিন্তু অপহৃতা নিগৃহীতা বন্দিনীদের মতই একটি করুণ সত্য আছে যা সমাজ শোনে নি শুনতে চায় না।

তার একটা আবেদন তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ চাঁপা দেখলে সুধাংশুবাবু তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সে এ দৃষ্টির সম্মুখে এতটুকু সংকোচ অনুভব করলে না। বললে—বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটি তার কেঁপে উঠল, —আমার নীলুকে আপনি বাঁচান। লোকে বলছে আপনি পারেন।

-- তার আগে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব।

—বলুন।

—আদালতে তোমাকে পুলিস সাক্ষী মানবেই। মানতেই হবে। তুমি আমার কাছে যা বললে যেমন অকপটে বললে তেমনিভাবে বলতে পারবে ? স্বীকার করতে পারবে ? হয়তো বিশ্রী প্রশ্নও করতে পারে। সরকার পক্ষ পারে আমিও পারি। সত্য উত্তর দিতে পারবে ?

মেয়েটি আস্তে আস্তে বললে—পারব।

সুধাংশুবাবু বললেন—তাহলে তোমার ছেলের কেস আমি নিলাম। তাকে বাঁচাতে চেষ্টা আমি করব। কি হবে তা জানি না। আজ আমি উঠব। বাকিটা পরে শুনব। পুলিস মামলা দায়ের করলে চার্জশীট দেখে সব জেনে নেব তখন।

—তাহলে আজ আমি যাই !

—এই রাত্রে—

—আমি পারব। পাড়ার ঘুঁটেওয়ালী বুড়ী আমার সঙ্গে এসেছে। একটু দূরে ওই পান বিড়ির দোকানে বসে আছে।

ড্রইংরুমের খোলা দরজা পার হয়ে সেই বর্ষারাত্রের স্বল্পালোকিত আবছায়ার মধ্য দিয়ে সে একলাই চলে গেল। পানবিড়ির দোকানটা একটু আগে। একটা বাঁকের মাথায়।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুধাংশুবাবু।

পাঁচ

মহামান্য বিচারপতি এবং জুরি মহোদয়গণ! এই এক নৃশংস এবং কুৎসিত হত্যাকাণ্ডের বিবরণ আপনাদের সমক্ষে বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য সহযোগে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আনুপূর্বিক সংঘটনের মধ্যে এতটুকু কোথাও ছিদ্র নেই।

ডকে দাঁড়িয়ে ওই যে তরুণ আসামী—বয়সে তরুণ আকারে অবয়বে যে কোন ভদ্রসন্তানের মত কিন্তু প্রকৃতিতে সে নিষ্ঠুর ক্রূর উদ্ধত ভয়হীন; যে অঞ্চলে সে বাস করে সে অঞ্চলে তার ডাকনাম 'টাইগার'। এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। যে নামকরণ করেছিল সে ভুল করে নি।

বাঘের মতই সে হিংস্র এবং নিষ্ঠুর। পুলিসের খাতায় তার বিবরণ আজ তিন বছর ধরে লেখা হচ্ছে। প্রথম বৎসর মাসে একবার—দ্বিতীয় বৎসরে মাসে দুই বা তিনবার এবং এই তৃতীয় বৎসরে সাত মাসে আরও বেশীবার রেকর্ড করা হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া, দলে দলে ঝগড়া, দলবদ্ধ হয়ে পাড়াতে আগন্তুকদের সামান্য অজুহাতে আক্রমণ করা, রাত্রির অন্ধকারে ছেনতাই, এমন কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও ইদানীং এ পাড়ার যারা সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করে; মহামান্য বিচারপতি, এইকালে 'মস্তান' বলে উর্দু শব্দটি বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, সমাজ এমন কি রাষ্ট্রের অবস্থাকে যারা সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে সেই এক কুখ্যাত মস্তানদের সে প্রধান। সার্বজনীন পূজার চাঁদা আদায়ে জবরদস্তিতে, বিসর্জনের সময় অন্য পাড়ার পূজোর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সামান্য অজুহাতে ঝগড়া বাধিয়ে সে এই অঞ্চলের পক্ষে একটা বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। হাতবোমা তৈরি করার দক্ষতায়, বোমা ছোঁড়ায় তার কথা লোকে সভয়ে উচ্চারণ করে। বোমা তৈরি করতে গিয়ে একবার বারুদ জ্বলে গিয়ে গোটা ডানহাতখানা জখম হয়েছিল। হাসপাতালে ছিল এক মাস। বোমা ছোঁড়ার অপরাধে পুলিস তাকে বারোবার অ্যারেস্ট করেছে কিন্তু সাক্ষী কেউ দিতে চায় নি বলে, ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ছুরি মারার জন্য পুলিস ওকে সন্দেহ করেছে কয়েকবারই। কিন্তু সেখানেও প্রমাণাভাবে গায়ে হাত দিতে পারে নি। ধরে নিয়ে গেছে—তাকে পুলিসী জিজ্ঞাসার সামনে এনেছে। কিন্তু তার ধাতু বিচিত্র ধাতু। যে উত্তাপে ইস্পাত গলে সে-উত্তাপের মধ্যেও ও অনমনীয় থেকেছে। এবং সে স্বীকারও করেছে যে এই খুন সে করেছে। এক্ষেত্রে বার বার আসামীর তরুণ বয়সের দিকে বিচারক ও জুরি মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব ওর মার দিকে। সে এই মামলার প্রধান সাক্ষী। আপনারা দেখেছেন আসামীর মাকে।

তার কপালে একটা কাটা দাগ আছে বিচারক সেটা দেখবেন। সেটা ওর মায়ের কপালে এই ছেলে তার নিজের হাতে আঘাত করে চিরদিনের মত একটা শিলালিপি এঁকে দিয়েছে। একখানা ভাঙা থালার কানা দিয়ে মেরেছিল কপালে। তাকেও হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল কয়েক দিন। ঘটনাটা ঘটেছিল ওদের বাড়ির ভিতর—মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অজ্ঞান অবস্থাতেই তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে-

ছিলেন কারণ পেশেন্টের অবস্থা ভাল ছিল না। প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। এবং তাঁরাই খবর পাঠিয়েছিলেন পুলিসে। পুলিস এখানেও সন্দেহ করেছিল এই তার টাইগার নামধারী মানুষের অবয়বে জন্তুর মত সন্তানটিকে। মা তখন একথা স্বীকার করে নি কিন্তু এখানে অর্থাৎ এই মামলায় স্বীকার করেছে যে ও আঘাত ওর ওই ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রকৃতির জন্তুর মত পুত্রটির। ওই সে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর ওই পিঙ্গলবর্ণাভ দৃষ্টি, ওর এই তরুণ বয়সেও এই তরুণ মুখের রেখায় রেখায় নির্মম কাঠিন্য ভ্রূর ভ্রূকুটিভঙ্গীতে, ওর দেহের কঠিন নিষ্ঠুর গড়নের মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে যা—

এবার সুধাংশুবাবু উঠে দাঁড়ালেন—আপত্তি করবেন তিনি। কিন্তু তার আগেই জজসাহেব বললেন—আপনি, আমার বোধ অনুযায়ী সীমানার বাইরে যাচ্ছেন; ওর এই অল্পবয়সের যে-সব ঘটনার ইতিহাস দিলেন তার উল্লেখ করলেন তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওর চেহারা নিয়ে এর সঙ্গে জড়াচ্ছেন—এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, he is a born criminial, crime is in his blood. কিন্তু আমার মতে জোর করে এটা আরোপ করা হচ্ছে।

সরকার পক্ষের অ্যাডভোকেট তাঁর বক্তব্য নিবেদন করছিলেন।

কোর্টে ভিড়ের আর শেষ ছিল না। ভিতর থেকে বাইরের বারান্দা পর্যন্ত লোকেরা দাঁড়িয়ে শুনছে। রুদ্ধশ্বাসে শুনছে।

হাওড়ার টাইগারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে মামলা হচ্ছে। ভ্রষ্টা মায়ের সন্তান। মায়ের উপপতিকে খুন করেছে। বরেন মালিক অর্থাৎ মল্লিক আজ ষোল-সতের বৎসরের উপর—নিখুঁতভাবে গণনা করলে আজ সতের বছর কয়েক মাস এই মেয়েটিকে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে রেখেছিলেন। লোকে বলে সংসারটাই সে পোষণ করত একরকম। কেউ কেউ বলে টাইগারের উদ্ভবও ওই বরেন মল্লিক থেকে। সুতরাং এর মধ্যে কোথাও যেন আছে প্রকৃতির সেই বিচিত্র খেলা বা লীলা, যার অমোঘ ঘাতে প্রতিঘাতে 'পিতা পুত্রহত্যা করে, পুত্র পিতৃহত্যা করে' প্রকৃতিরও অন্তরালবর্তিনী এক রহস্যময়ীর অভিপ্রায় পূর্ণ করে; অথবা সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে আছে এক আশ্চর্য নাটক যা অতিপুরাতন হয়েও আজও পুরানো হয় নি বা হবে না।

ডকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে হাওড়া শহরের টাইগার। আসামী নীলু।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে সেসনস্ সোপরদ্দ হয়ে দায়রা আদালতে বিচার বসতে প্রায় পাঁচ মাস সময় গেছে। এই পাঁচ মাসে নীলুর চেহারা যেন আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে। সরকার পক্ষের উকীল যা বললেন তার সঙ্গে এতটুকু মেলে না। নীলু এই বিচার মাথায় করেও জেলখানার মধ্যে নিয়মিত শান্ত জীবন যাপনের সুযোগে দেখতে যেন আর এক নীলু হয়ে উঠেছে!

পিঙ্গল বর্ণ আর নেই, তার মধ্য থেকে ফুটে উঠেছে একটি স্বর্ণাভ দীপ্তি। শরীর তার সবল এবং কঠিন—তাকে ঢেকে একটি প্রসন্ন পুষ্টির প্রলেপ পড়েছে। চোখের কোলে চারিপাশে ছিল একটি কালো ঘের—সে ঘেরটি আর নেই। সযত্ন মার্জনায় কেউ যেন আঁচল দিয়ে সে দাগ মুছে দিয়েছে। মুখে তার অল্প অল্প দাড়িগোঁফ বেরিয়েছে। চুল তার কটাসে অর্থাৎ পিঙ্গল। দাড়িগোঁফগুলি পিঙ্গল নয় স্বর্ণাভ। চোখ দুটি তার বড় জন্ম থেকেই। তার বুদ্ধি

বয়সের সঙ্গে হয়ে উঠেছিল উগ্র রূঢ় এবং হিংস্র ; সে দৃষ্টি এই ক'মাসে আশ্চর্য এক ঔদাসীন্যে উদাসীন হয়ে উঠেছে। কোন উদ্বেগ নেই কোন চঞ্চলতা নেই। ডকের মধ্যে যেন শূন্যদৃষ্টিতে অথবা গভীর এক আত্মমগ্নতায় মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হয়তো সওয়ালের সব কথা তার কানে পৌঁছুলেও সচেতন মনে পৌঁচুচ্ছে না। মাথার চুলগুলি দীর্ঘ এবং বিশৃঙ্খল ; তৈলহীন রুক্ষ ; গায়ে একটা রঙচঙে হাওয়াই সার্ট পরনে একটা চোঙা প্যান্ট। পরিষ্কার নয় ; জামাটা ক'জায়গায় ছিঁড়েও গেছে। ভ্রূক্ষেপহীন ভঙ্গিটার প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন গভর্নমেণ্ট প্লীডার।

সরকারী উকীল তৎক্ষণাৎ বললেন—আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করছি ইওর অনার। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই আসামী হাওড়া শহরে টাইগার নাম অর্জন করেছে তার এই ষোল বৎসরের জীবনের যে গৌরবে সে গৌরব তার মস্তানীর গৌরব।

মহামান্য বিচারক, মানুষ জন্তুর বা জীব ও প্রাণীর মতই দেহধারী জীব। কিন্তু জীবজীবনের জৈব ধর্মের নির্দেশ তার জীবনসত্য নয়। কাম ক্রোধ লোভ ক্ষুধা তৃষ্ণাকে সে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারে না এ কথা বৈজ্ঞানিক বাস্তব সত্য কিন্তু মানবধর্মে তা থেকেও অধিকতর সত্য যে এই জৈব বিধানগুলিকে সে আপন আয়ত্তাধীনে এনে মনুষ্যত্বে উপনীত হয়েছে। মানুষ এইখানেই জন্তু থেকে পৃথক।

বর্তমান মামলায় যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আপনার এবং জুরি মহোদয়গণের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে তাতে দেখতে পাবেন যে, ঘৃণিত প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে মনুষ্যধর্মের প্রথমতম বা প্রাথমিক সত্য বা বিধানকে কুৎসিতভাবে দুই পায়ে ছেঁটে-মেড়ে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যিনি হত হয়েছেন যাঁকে হত্যা করা হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম ছিল বরেন মল্লিক ; ১৯৬০ সাল থেকে সতের বছর আগে একটি যুবতী এসে আত্মবিক্রয় করেছিল এবং সেই ক্রয়বিক্রয়ের ঘটনায় সাক্ষী ছিল তার বাপ এবং তার স্বামী।

ঘটনাটি অসামাজিক। মনুষ্যত্বসম্মত নয়। কিন্তু জৈব প্রবৃত্তির গতি এবং মানুষের মনের নির্দেশের সঙ্গে দ্বন্দ্বসংকুল মনুষ্যত্বের বা মনুষ্যধর্মের যে-পথ সে-পথে এই ধরনের পতন ও স্খলনগুলি নিঃসন্দেহে বিয়োগান্ত কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। এমন ঘটে থাকে। অতীতকালে ঘটেছে বর্তমানেও ঘটছে। ভবিষ্যতেও ঘটবে। তাছাড়াও এক্ষেত্রে আরও একটি কথা আছে। স্বামী ও পিতার সাক্ষাতে যেখানে একটি যুবতী নিজেকে বিক্রি করে সেখানে এমন কোন কারণ আছে যা নিষ্ঠুরতম বাস্তব সত্য। যা অলঙ্ঘনীয় যা অপরিবর্তনীয়, মাননীয় বিচারক মহোদয়, তার থেকেও বেশী কিছু। প্রকৃতির নির্দেশ। আজ সতের বৎসর ধরে এই মল্লিক এই যুবতীর সঙ্গে নরনারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক-স্থাপন করে এই দুঃস্থ সংসারটিকে প্রতিপালন করে আসছিল। সর্বোপরি এই যুবতী মেয়েটি তার সঙ্গে অর্থাৎ এই মল্লিকের সংসর্গে আসবার এক বছর পর এই বালকের জন্ম। সুতরাং বলি এই মল্লিকই এই হত্যাকারী বালকের—

—না—না—না—না।

পর পর চারটে 'না' শব্দের প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর ধ্বনিতে দায়রা আদালতের প্রকাণ্ড ঘরখানা

চমকে উঠল।

চীৎকার করে উঠল আসামীটি। সমস্ত জনতা নিবিষ্ট মনে গভর্নমেণ্ট প্লীডারের এই বক্তৃতা শুনছিল। তারা কৌতূহলে আকৃষ্ট ছিল, বক্তব্যের জটিল অর্থ অনুধাবনের জন্ত নিবিষ্ট-চিত্ত হয়েছিল। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এই ক্রুদ্ধ প্রচণ্ড এবং দৃপ্ত চীৎকারে চমকে উঠল তারা। তরুণ কৈশোরের ভাঙা চেরা কণ্ঠস্বরে সবল বুকের চীৎকার।

বিচারকও চকিত হয়ে আসামীর দিকে তাকালেন। সে দুই হাতে মুঠো করে চেপে ধরেছে ডকের বেষ্টনীর কাঠখানা। চোখ দুটো তার জ্বলছে। মনে হচ্ছে সে যেন হাঁপাচ্ছে।

জজসাহেব তার দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন। তাঁর ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি? কি না? বল, তুমি কি বলছ?

একজন কনেস্টবল এবং একজন কোর্ট সাবইন্সপেক্টর ছুটে এসে কাঠগড়ার সামনে দাঁড়াল। রূঢ়স্বরে ধমক দিয়ে বললে—চুপ! চুপ!

মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বড় বড পিঙ্গলাভ রুক্ষ চুলের রাশিতে নাড়া জাগিয়ে সে বললে—না না। আমি চুপ করব না।

কোর্ট চঞ্চল হয়ে উঠল। উকীল মোক্তার কর্মচারী জনতা সমস্ত লোকের মধ্যে একটা গুঞ্জন জাগল—একটা নড়াচড়ার ঢেউ জাগল। শুধু জজসাহেব একটি স্থৈর্যপূর্ণ ধীরতার সঙ্গে বসে রইলেন। তাকালেন তরুণ আসামীটির দিকে। টেবিলের উপরে রাখা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে শব্দ করে তাঁর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে জনতাকে স্তব্ধ হতে বললেন। অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—চুপ! চুপ! তারপর আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—বল তুমি কি বলছ? কি না? বল?

উত্তেজিত কণ্ঠে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পাবলিক প্রসিকিউটরের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল—হুজুর জজসাহেব—যে মল্লিক খুন হয়েছে—হুজুর—।

বুকে দুবার ডানহাতের চাপড় দিয়ে যেন আস্ফালন করেই বললে আমি তাকে খুন করেছি হুজুর—আমি। আমি তাকে খুন করেছি হুজুর। তিনবার ছোরা মেরেছিলাম তাকে। পেটে, বুকে—তারপর পড়ে গেল—তখন পিঠে।

থেমে গেল আসামী। যেন কি বলবে সে খুঁজে পাচ্ছে না। চোখ দুটো শুধু দপ্‌দপ্‌ করছে জ্বলন্ত আগুনের মত।

পাবলিক প্রসিকিউটর তার এই কথা-হারানো বিভ্রান্তিকর অবস্থার সুযোগে বললেন—রক্তের সম্পর্ক ছিল না কিন্তু সম্পর্ক ছিল—বিধবা রত্নমালা নিহত মল্লিকের রক্ষিতা ছিল—

—না! আবার চীৎকার করে উঠল আসামী!—না না!

—মল্লিকের লোক এসে রত্নমালাকে নিয়ে যেতো না? মল্লিকের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত না সদর রাস্তায়? রত্নমালা সেজেগুজে বেরিয়ে যেতো না?

—না, রক্ষিতা সে ছিল না। সে তার কেনা বাঁদী ছিল। হুজুর জজসাহেব, এইকালেও মানুষ বিক্রি হয়। বাপ মেয়ে বিক্রি করে হুজুর—স্বামী স্ত্রী বিক্রি করে হুজুর—আর হতভাগিনী

ওই বিক্রি হওয়া মেয়েটা কেনা বাঁদীর মত, চিরকাল জন্তু-জানোয়ারের মতই খেটে মরে যায় তবু তার গলার বাঁধন খোলে না। দড়ি দিয়ে সে বাঁধা থাকে মরণকাল পর্যন্ত। মরে গেলে দড়ি-গাছাটা খুলে নিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেয়। তেমনি করেই আমার ওই মা—।

এইখানে এসে হা-হা করে কেঁদে ফেললে দুর্দান্ত ছেলেটা।

—কে বললে এসব কথা তোমাকে? তুমি কেমন করে জানলে?

—শুনেছি আমার ওই হতভাগিনী মায়ের কাছে।

—মা তোমাকে বলেছে এইসব কথা?

—হ্যাঁ হুজুর—মায়ের কপালে একদিন একখানা কানাভাঙা থালা দিয়ে মেরেছিলাম। কেটে বসে গিয়ে অনেক রক্ত পড়েছিল। সেই দিন বলেছিল—তবে শোন তোকে আজ সব বলে যাই। আমার নিজের ইচ্ছেতে আমি ওই পাপ করি নে। আমার বাপ আমাকে বিক্রি করে ছিল। দু'হাজার টাকা সে নিয়েছিল। এই লোকটাই আমার হাতে দিয়েছিল টাকা। আমি মাটির পুতুলের মত বসে ছিলাম—আমার হাতে লোকটা ধরিয়ে দিয়েছিল দু'হাজার টাকার নোটের গোছা। আমি মাটির পুতুলের মতই বসে ছিলাম। একসময় বাবা সেগুলো টেনে নিয়ে পকেটে ভরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। ওই ঘরখানার মধ্যে ওই লোকটার কাছে আমাকে ফেলে দিয়ে।

হুজুর, আমার বাবা প্রণব চক্রবর্তী—সে ঠিক আমার মতই দেখতে, সেও—সেও—; স্তব্ধ হয়ে গেল এই প্রচণ্ড ছেলেটি। দুই হাতে তার চুলের মুঠো ধরে কাঠগড়ার রেলিঙের উপর কনুই রেখে মাথা হেঁট করলে।

কিছুক্ষণ পর বললে—বাবার কাছে মা নাকি বলেছিল—তুমি আমাকে বিষ এনে দাও। আমি মরি। বাবা বলেছিল—না, লোকটাকে আমি খুন করব। কিন্তু ছুরি তুলেও ছুরি মারতে পারে নি—হাত থেকে পড়ে গিছল। লোকটা বাবাকে ধরে ফেলে তার কাছ থেকেও বিক্রির একটা দলিল লিখিয়ে নিয়েছিল। মাকেও তাতেই সই করিয়েছিল। সে কাগজখানা তার কাছে ছিল। বাবাকে এরপর আরও দু'হাজার টাকা দিয়ে একটা ধারের দলিল লিখিয়ে নিয়েছিল।

হুজুর—জজসায়েব—বাঁচতে আমি চাই নে। মরতে আমার ভয় নেই। আমাকে ফাঁসি আপনারা দিন। আমি খুন ওই লোকটাকে করেছি। খুন করেই আমি পালিয়েছিলাম, ওইটে আমার দোষ হয়েছে। তবে ভোরবেলাতেই এসে আমি ধরা দিয়েছি থানায়। ফাঁসি যাবার জন্যেই ধরা দিয়েছি। উকীলবাবু বলছিল আমি মস্তান। হ্যাঁ হুজুর, আমি মস্তান। ওই ওই আমার মায়ের জন্যে! হুজুর—

হুজুর, সারা জীবনে আমার বয়স ষোল বছর হল—এই ষোল বছরে কোন দিন কখনও আমাকে আমার ওই মা,—

হুজুর, ওকে আমি রাক্ষুসী বলে ডাকতাম ছেলেবেলায়। এই দেখুন আমার কপালে একটা মস্ত কাটা দাগ। ওই মা আমাকে খুন্তি দিয়ে মেরেছিল। আমার মনে আছে হুজুর—রক্ত পড়েছিল অনেক—আমার দিদিমা ভয় পেয়ে কেঁদেছিল আমিও ভয় পেয়েছিলাম কেঁদেছিলাম। মা বলেছিল মর মর তুই মরে যা! ছেলেবেলা আমার পাঁচড়া হয়েছিল—আমার কষ্টের শেষ ছিল না। সর্বাঙ্গে তার দাগ। কখনও মা আমার মলম লাগিয়ে দেয় নি ভাল কথা বলেনি। সকালবেলা কাজে যেত—আমি কাঁদতে কাঁদতে পিছনে পিছনে যেতাম—পথে হুঁচোট খেয়েছি, পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটেছে হাঁটু ছড়েছে—কখনও হাতে ধরে তোলে নি কখনও আহা বলে নি।

ওই একটা কথা—মর মর মর—তুই মরে যা তুই মরে যা।

হুজুর পাঠশালায় গেলাম—ছেলেরা ক্ষেপাতে আরম্ভ করলে। বলত—বাবার নাম কি রে? বুঝতে পারতাম না প্রথম প্রথম। তারপর বুঝলাম। আবার বলত—তুই চক্রবর্তী কি করে হলি রে? তুই তো মল্লিক নাকি?

দিদিমা যতদিন ছিল ততদিন কিছু আদরযত্ন পেয়েছি হুজুর—তারপর সে মরার পর দুনিয়া আমার তেতো ছিল—এবার বিষ মিশল বিষাক্ত হল। ইস্কুল ছাড়লাম—মস্তান হলাম।

উকীলবাবু বললেন মস্তান। হাঁ হুজুর, মস্তানদের সর্দার হলাম আমি। সিগারেট বিড়ি আরও নেশা শিখলাম। মানুষ মারতে শিখলাম। মন খুব খুশী হল। মাকেও মারতে ধরলাম। প্রথম চড়চাপড়। চড় খেয়েও মা গাল দিত—তুই মর তুই মর।

সঙ্গে সঙ্গে আবার চড় মেরেছি আমি।

আবার বলেছে—মর মর।

আবার মেরেছি।

আবার বলেছে—মরে যা তুই মরে যা।

—ফের বলছিস? বলে আবার চড় মেরেছি।

ফের বলেছে—হ্যাঁ আবারও বলছি, তুই মরে যা! চণ্ডালের সন্তান চণ্ডাল তুই। তুই মরে যা আমি খালাস পাই।

আমি এবার ভয় পেয়ে হার মেনে চলে গিয়েছি ঘর থেকে। পথে গিয়ে কোন ফিরিওলাকে কি অন্য কোন মস্তানের সঙ্গে ঝগড়া করে মাথা ফাটাফাটি করে হাওড়া স্টেশনের ফুটপাথে কি গঙ্গার কোন ঘাটে গিয়ে বসে থেকেছি—সারা দিনরাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। ঘরে মা গাল দিয়েছে—মায়ের বেদনা বুঝি নি বুঝতে চেষ্টা করি নি—বাইরে গাল খেয়েছি তাই নিজে গাল দিয়ে মস্তানী করে ফিরেছি। মনে ছিল লজ্জা—হুজুর এমন লজ্জা আর হয় না। এর চেয়ে মরণ ভাল এর চেয়ে নরক ভাল—এর চেয়ে খুন হওয়া ভাল খুন করা ভাল: নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতাম—আমি চক্রবর্তী না মল্লিক? আমি কি?

বলতে বলতে থেমে গেল দুর্দান্ত ছেলেটি।

সমস্ত কোর্ট রুমটা থমথম করছিল। মানুষেরা রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনছে। একটা সুচ পড়লেও শোনা যায়। মাথার উপরে কয়েকটা চড়ুইপাখী উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। একটা মিনিট স্তব্ধতা

যেন অনেক কয়েক মিনিট দীর্ঘ মনে হল। তবুও তাকে প্রশ্ন কেউ করলেন না—তারপর ?

জজসাহেবও স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—তাঁর হাতে পেনসিল ছিল একটা, অকস্মাৎ সেটা হাত থেকে খসে টেবিলের উপর এবং টেবিল থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সেই শব্দে সজাগ হয়ে উঠল ছেলেটি। বললে—হুজুর, একদিন মায়ের বাক্স খুললাম। মায়ের জিনিসপত্র ছিল না কিন্তু ট্রাঙ্ক ছিল তিনটে। যত বাজে ভাঙা ফুটো জিনিস ভর্তি থাকত। একটা বাক্সের দরকার ছিল। বোমা তৈরি করেছিলাম—সেগুলো নিয়ে যাবার জন্যে বড় বাক্সেরই দরকার ছিল। খড় ন্যাকড়া নিচে দিয়ে আরও খড ন্যাকড়া দিয়ে প্যাক করে তার ওপর খানকতক কাপড বই দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে। বড একটা হাঙ্গামা আছে। দলে দলে হাঙ্গামা হুজুর। বাজারে বাক্স কেনার হাঙ্গামা ছিল। তাই বাড়ির বাক্স একটা খালি করে নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম। আমার মা সে-দিন—।

—সন্ধ্যের পর। মা বাড়ি ছিল না। একটা বাক্স খালি করে ফেললাম। হুজুর, তার মধ্যে পুরনো ছেঁড়া একটা গরম কোট ছিল। কতকগুলো কাগজ ছিল। একটা সিগারেটের কেস ছিল। পুরনো রুমাল ছিল। হুজুর, সব শেষে ছিল—একখানা ফটো। অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

হুজুর, আলোতে ছবিখানা দেখলাম, দেখে আমি চমকে উঠলাম। এ কে ? এ কে ? চেয়ারে বসে ? আর পাশে দাঁড়িয়ে ?

চিনতে পারলাম হুজুর।

মাকে চিনলাম আগে। বিয়ের কনে আমার মা। মাথায় মুকুট গায়ে গয়না পরনে দামী শাড়ি। তারপর চিনতে বাকী রইল না চেয়ারে যে বসে তাকে। সে আমার বাবা প্রণব কুমার চক্রবর্তী। দেখলাম হুজুর—অবিকল আমি।

আমার সব ভুল হয়ে গেল। আমি ভুলে গেলাম আমাকে ট্রাঙ্ক নিয়ে যেতে হবে। আমি ভুলে গেলাম। ছবিটা নিয়েই বসে রইলাম আলোর সামনে। কালীপডা একটা লণ্ঠন। তারই আলোতে অবাক হয়ে দেখলাম। আমি শুনেছিলাম—দিদিমা মাঝে মাঝে বলত—আমি বাবার মত দেখতে। মা আমাকে দেখে হয় মুখ ফিরিয়ে নিত নয় বিরক্ত হত—তার চিহ্ন ফুটত তার মুখে। আমি এ ছবি কখনও দেখি নি। বাবা যখন মারা যায় তখন আমি এক বছরেরও নই। সেদিন এই ছবি দেখে আমার যে কি হল তা বলতে পারব না। মনে হল আমি যেন রাজা হয়ে গিয়েছি। মনে হল ছবিখানা নিয়ে সারা হাওড়ার পথে পথে দেখিয়ে আসি—চীৎকার করে বলে আসি—দেখ আমার বাবার ছবি দেখ।

দলের লোক ডাকতে এল—তাকে ট্রাঙ্কটা দিয়ে দিলাম—আমি গেলাম না। বললাম—যাব না আজ। আমাকে ডাকিস নে। খুনোখুনি হয়ে যাবে। পালা। সে চলে গেল। আমি ক্যাপার মত ঘরে ঘুরতে লাগলাম। ঠিক এই সময় এল আমার মা।

মাকে আমি রাক্ষুসী বলতাম। বলতাম তার ওপর রাগের জন্যে—যেভাবে সে মারত তার

জন্যে। পরে আর একটা চেহারার জন্যেও বলতাম। সে যে সাজ করে ওই একটা লোকের সঙ্গে বেরিয়ে যেত সপ্তাহে একদিন করে রাত্রে তার জন্যে। সে ঘরে তালা দিয়ে বাইরে যেত। আমার তো ঠিক ছিল না কিছু। আমি ঢুকতাম পাঁচিল টপকে। তারপর ঘরের চাবি খুলে নিতাম—সে চাবি আমার কাছে থাকত। ঘরের তালা খুলে মা ওই সাজে ঢুকতেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, কোথায় গিয়েছিলি?

মা চমকে উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

আমার রাগ চড়ে চড়ে উঠেছিল—বললাম—বল, আজ তোকে বলতে হবে। কেন তুই যাবি এমনভাবে? তোর লজ্জা নেই তোর হায়া নেই?

মা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—সরে যা—সরে যা নীলু—আমার মাথায় খুন চড়িয়ে দিস নি।

আমি সরি নি। পথ দিই নি ঘরে ঢুকতে।

মা বলেছিল—নীলু! সর আমি চান করব।

—হুজুর, বাইরে থেকে এসে মা চান করত। সে সেই বোধ হয় গোড়া থেকেই। আমি আজন্ম দেখে আসছি।

আমি বললাম—না। আগে তোকে বলতে হবে কেন তুই আমার বাবার মুখে আমার বংশের মুখে এমন করে কালী মাখিয়ে দিবি? আমার বাবা মরে গিয়েছে সে কি তার—

মা আমার কথায় বাধা দিয়ে বলেছিল—তোর বাবাকে আমি ঘেন্না করি তোদের বংশকে আমি ঘেন্না করি। আর তুই? তোকে পেটে ধরে আমার লজ্জার শেষ নেই। অথচ তোর পরমায়ু—তুই হয়ে হয়েই মরিস নি।

আমি ঠাস করে এবার মায়ের মুখের উপর চড় কষিয়ে দিয়েছিলাম; শুধু চড় মারাই নয় হুজুর; ছেলেবেলা থেকে মায়ের উপর অহরহ রাগ করে থেকে থেকে মেজাজ আমার রাবণের চিতার মত জ্বলে—আমার বাবাকে আমার বংশকে গাল দেওয়া আমার সহ্য হয় নি। শুধু চড়ই মারি নি খারাপ কথা বলে গালও দিয়েছিলাম।

মা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। হুজুর, মায়ের সঙ্গে সমানে মারপিট করেছি—মা মারলে আমিও মেরেছি—হাতে কামড়ে দিয়েছি, ঢেলা ছুঁড়েও মেরেছি কিন্তু এমনভাবে কখনও গালে চড় মারি নি।

কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে আমার মুখের দিকে সাপের মত তাকিয়েছিল মা। আমি মনে করেছিলাম মা ভয় পেয়েছে—মা এবার বলবে—আর করব না। আমি ভাবছিলাম ওকে গলা টিপে মেরে ফেললে কি হয়!

অনায়াসে তখন আমি খুন করতে পারতাম। আমিই মায়ের হাত ধরে তাকে ঘরে টেনে এনে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম—তারপর বলেছিলাম, বল কেন তোর পাপে আমার চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে? বল?

মা বলেছিল—আমি যেদিন মরব সেদিন তোকে ডেকে সব বলে যাব। আর তুই যদি

মল্লিক তবে—

আমি তখন মরীয়া। আমার হাতের কাছেই পড়েছিল একখানা কানাভাঙা রেকাবি সেই-খানা তুলে নিয়ে মায়ের কপালে মারলাম—ভাবলাম না কি হবে! রেকাবির ধারটা কপালে খপ্ করে বসে গেল। বললাম—সীতা সাবিত্রী আমার—হারামজাদী—কুত্তার বেটী কুত্তি—

কথা আমার শেষ হল না—শেষ করতে পারলাম না আমি—মায়ের কপাল থেকে গলগল করে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে মুখখানাকে ভয়ংকর করে তুললে। আমি বোবা হয়ে গেলাম। চেয়ে রইলাম মুখের দিকে।

মা বাঁ হাত দিয়ে সেই রক্ত নেড়ে আঙুলে মেখে চোখের সামনে ধরে দেখে আস্তে আস্তে বললে—রামের মত স্বামী পেলে আমিও সীতা হতে পারতাম নীলু। তোর বাপ রাম ছিল না রে! রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল—রাম সমুদ্র বন্ধন করে রাবণকে বধ করে তারপর সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছিল। তোর বাবা রাম ছিল না—আমাকে কুত্তার বেটী বললি—আমার বাবা কুত্তার চেয়েও অধম জীব ছিল। অর্থের জন্যে বড়লোক লম্পটের পা চেটেছে—তাদের কাছে স্ত্রী কন্যা বিক্রি করেছে। আমাকে যখন বিক্রি করলে আমার হাতে নগদ দু'হাজার টাকার নোটের গোছা ধরিয়ে দিয়ে বাবা নির্লজ্জের মত পাষণ্ডের মত সেই টাকা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে পকেটে পুরে বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজাটা মল্লিক বন্ধ করে দিয়ে—।

হুজুর, মা আমার হাউহাউ করে কেঁদে উঠল একবার। বললে—ওরে নীলু, আমাকে সেকালে দাসী বাঁদী যেমন বিক্রি হত তেমনি করে বিক্রি করলে প্রথমে বাপ। আমি তখন ষোল বছরের মেয়ে—আমি কি করব? অসহায় অবলার মত পড়ে রইলাম—লোকটা আমাকে রাক্ষসের মত গোগ্রাসে গিললে—।

তোর বাবাকে তখন আমি দু'হাত বাড়িয়ে ডেকেছিলাম—তুমি স্বামী—তুমি আমাকে বাঁচাও বাঁচাও। বলেছিলাম—ভীম যেমন দ্রৌপদীকে কীচকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল তেমনি করে বাঁচাও। শুধু বাঁচানো নয় তুমি শোধ নাও। তুমি ওকে খুন কর। করে যদি ফাঁসি যেতে হয় যাবে—তুমি ভেবো না—আমি বিষ খেয়ে মরব। কিন্তু তোর বাবা কাপুরুষের অধম কাপুরুষ—আমাকে উদ্ধার করতে এসে ছুরি তুলে কাঁপতে লাগল থরথর করে, ওই রাবণ তার হাত ধরলে, ছুরিটা পড়ে গেল। তোর বাপ তার পায়ে গড়িয়ে পড়ে বললে—আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে ছেড়ে দিন। ওই আমাকে বলেছিল—। তোর বাপ আমার দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

আমি মাটির পুতুলের মত অবশ হয়ে গিয়েছিলাম—চোখেও বোধ হয় পাতা পড়ে নি—মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু শুনেই গিয়েছিলাম—মায়ের কাছে লিখিয়ে নিয়েছিল—আমাকে আপনি কিনিলেন—তার দাম দিলেন আমার বাবাকে আমার স্বামীকে। আমি চিরদিন কেনা হইয়া রহিলাম। বাবা লিখে দিয়েছিল—আমার স্ত্রী রত্নমালাকে স্বেচ্ছায় আপনাকে বিক্রয় করিলাম এবং দুই হাজার টাকা বুঝিয়া পাইলাম। তারপর বাবা নিজে নাকি নিয়ে যেত

মাকে সঙ্গে করে।

কপাল থেকে রক্ত ঝরে ঝরে মুখ ভিজিয়ে বুক ভিজিয়ে দিয়েছিল—মধ্যে মধ্যে থালা খানা হয়ে জমেও উঠেছিল—সেদিকে তারও খেয়াল ছিল না আমারও ছিল না। সব বলা শেষ করে মা বলেছিল—ওরে নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না সেই বাপের মেয়ে বলে। সেই স্বামীর স্ত্রী বলে। তোকে ক্ষমা করতে পারি নি ওই কাপুরুষ বাপের ছেলে বলে। তুই পেটে না এলে আমি হয়তো মরতাম মরতে পারতাম। তোকে কোন দিন স্নেহ করি নি কিন্তু তোর জন্যেই মরতে পারি নি।

বলতে বলতে মা ঢলে পড়ে গিছল। রক্তক্ষয়ে দুর্বল হচ্ছিল সে খেয়াল ছিল না। তারও ছিল না। আমারও ছিল না। যখন পড়ে গেল তখন মা বললে—নীলু, তুই লোকজন ডাক রে—তাদের সামনে বলব আমি নিজে রাগ করে কানাভাঙা রেকাবিখানা নিজের মাথায় বসিয়ে দিয়েছি।

হুজুর, আমি সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর শোধ আমি নেব। আমার মা। হুজুর, লোকে আমাকে মস্তান বলে—যার মায়ের উপর এমন অত্যাচার হয়—যার চারিদিকে কোন আনন্দ নেই আশা নেই সে মস্তান না হয়ে কি করবে? উপায় কি তার? মায়ের কাছে সব কথা শুনে অবধি আমি ঘুরেছি—পাগলের মত ঘুরেছি। তারপর ছোরা নিয়ে তৈরী হয়ে সেদিন দাঁড়ালাম ওই গলির মোড়ে।

বলতে ভুলেছি হুজুর, মাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল। মা লোকেদের কাছে বলেছিল নিজের কপালে সে নিজেই ভাঙা রেকাবি বসিয়েছে—হাসপাতালে বলেছিল এমন কাটা নিজের হাতে হয় না। লোকজনে বলেছিল—তাহলে ওর ছেলেই মেরেছে। তাও লেখা আছে পুলিসের খাতায়। তারপর মা বাঁচল—হাসপাতালে সাতদিন থেকে ফিরে এল। এসে বললে—নীলু, তুই চলে যা। আমি তোকে টাকা দিচ্ছি, এই বাড়ি বিক্রি করে টাকা দিচ্ছি তুই চলে যা কোথাও।

আমি মাকে কিছু না বলে চলেই গেলাম। চলে গেলাম না, লুকোলাম কাছেপিঠেই। বুকে আগুন জ্বলত অহরহ। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া হল। তাদের আমি ছাড়লাম, তারা আমাকে ছাড়লে। ছোরাখানা নিয়ে তকে তকে থাকতাম। জানতাম মা সপ্তাহে একদিন যায়। ঠিক করেছিলাম প্রথম দিনেই রাক্ষসকে আমি বধ করব। আর এক দিন এক বারও সে আমার মায়ের গায়ে হাত দেবে তার থেকে আমার মৃত্যু ভাল। কিন্তু তা পারি নি হুজুর। সে আমার আপসোস। এত আপসোস আমার বাবা দাদামশায়ের কাজের জন্যেও হয় নি। প্রথম দিন গাড়ি এল কিন্তু সে এল না।

দ্বিতীয় দিন গলির মুখে অন্ধকারে দাঁড়ালাম।

একটা লোক নেমে ভিতরে গিয়ে মাকে ডেকে আনলে।

রাক্ষসটা নামলে। এগিয়ে এলে বললে—এস।

আমি লাফিয়ে পড়লাম। পেটে ছুরি চালালাম। তারপর বুকে বাঁদিকে আনদিকে।

লোকটা পড়ে গেল। যে লোকটা মাকে ডাকতে গিছল সে ভয়ে ছুটে পালাল। গাড়ির ভিতর থেকে ড্রাইভারটা চীৎকার করে উঠল। মা বলে উঠল—নীলু!

বললাম—হ্যাঁ। এই তোকে খালাস করে দিলাম। এরপরও যদি এই পাপ তুই করিস তবে তুই যা বলেছিস সব মিথ্যে আর তার জন্যে তোর কুষ্ঠ হবে জেনে রাখিস। যদি না হয় তবে ফাঁসি যাব আমি—আমি মরা ঈশ্বরকে নরককুণ্ডের পাঁকে পুঁতে দেব চিরদিনের মত।

আমাকে ফাঁসির হুকুম দিন।

আমি খুন করেছি। আমার মাকে যে টাকার জোরে জন্তু-জানোয়ারের মত কিনেছিল তাকে খুন করে আমার মাকে আমি খালাস করেছি।

ঠিক এই মুহূর্তে একটা গুরুভার কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে সারা আদালত ঘরটা চকিত হয়ে উঠল। কি পড়ল? আসামীও চুপ করলে এবং সেই দিকে তাকালে যেদিক থেকে শব্দটা উঠেছিল।

উঠেছিল সামনের দিক থেকেই।

একটি অতি বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

মা।

তার মা চেয়ারে বসেছিল—সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। কোর্ট অ্যাডজোর্নড হল সেদিনের মত।

ছয়

"মানুষের প্রতি কি মানুষের অন্যায় করবার অধিকার আছে? প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। এ অধিকার নাই। তবু অন্যায় ঘটে। মানুষ মানুষের উপর সজ্ঞানেই অন্যায় করে। তাহার প্রতিবিধানের জন্য দেশে আইন আছে কানুন আছে শাসন আছে শৃঙ্খলা আছে তবু অন্যায় হয়। এবং বহু ক্ষেত্রে সে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। আইন অসহায়ভাবে দুর্বল হয়ে মাথা নত করে। মানুষের ন্যায়বোধ নীতিবোধ সমস্ত কিছুকে মানুষেরই প্রবৃত্তি সরীসৃপের মত বিষাক্ত দংশনে বিনষ্ট করে। আইন শৃঙ্খলার লোহার বাসরঘর নির্মাণ করে মানুষ ন্যায়নীতির লখীন্দরকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সূচীপ্রমাণ ছিদ্রপথে কালনাগিনী প্রবেশ করে লখীন্দরের প্রাণ হরণ করছে যুগ যুগ ধরে। মানুষ অসহায়ভাবে মেনে নেয় এবং এই সরীসৃপ প্রবৃত্তিকে মাথা নত করে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে। বর্তমান ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আসামী নীলু চক্রবর্তীর জীবন নিষ্ঠুর অভিশাপে অভিশপ্ত জীবনের একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

জন্মের বোধ করি প্রথম মুহূর্ত থেকে সে তার মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত, সম্ভবতঃ ঠিক বলা হল না—মাতৃরোষের দ্বারা তিলে তিলে সে দগ্ধ। সমাজে সে চরমতম অপমানে অপমানিত, লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত। এক কামার্ত নরপিশাচের কুটিলতম অত্যাচারে অত্যাচারিত।

পাবলিক প্রসিকিউটর বলেছেন সাক্ষীদের দ্বারা তিনি প্রমাণিত করেছেন যে আসামী কুখ্যাত একজন মস্তান। স্থানীয় লোকেরা তার নামকরণ করেছে টাইগার। অর্থাৎ হিংস্র শ্বাপদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং হিংস্র শ্বাপদ।

হয়তো তাই।

এ সম্পর্কে আসামীপক্ষের অ্যাডভোকেট বলেছেন—হয়তো তাই। যার মায়ের অপমান হয় ধনী ব্যভিচারীর কলুষিত থাবার নীচে, যে বালকের জীবনে কোন সম্মান নেই সমাদর নেই সে যদি সত্যই প্রাণবন্ত হয় তবে বাঘের মত হিংস্র হয়ে নিষ্ঠুরভাবে বর্তমানের সব কিছুকে ভেঙে-চুরে চূর্ণ করে না দিয়ে তার পথ কোথায়? যাকে কেউ স্বীকার করে না তাকে আপন শক্তিতে স্বীকার করাতে হয়, সকল অত্যাচারকে রোধ করতে হয়।

মানুষের কাছে সকল অত্যাচারের চরম অত্যাচারে—মায়ের অপমান।

আসামীপক্ষের অ্যাডভোকেট বলেছেন—সারা দেশের অবস্থা এবং দেশের তরুণদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলতে ইচ্ছে করে যে এই বালক এবং তার মা তার প্রতীক।

এ কথা স্বীকার করতে আমারও ইচ্ছা হয়। এবং বলতে আমি বাধ্য যে এই বালকের মায়ের উপর যে কুটিল এবং কল্পনাতীতরূপে কুৎসিত অত্যাচার হয়েছে, আইনসংগতভাবে তার প্রতিকার হয়তো পেতে পারত কিন্তু এর শোধ নেবার অধিকার তার ছিল না। এ কথাও সত্য যে, বিচিত্র মানুষের সমাজের অতীত-কালের প্রভাবে ওই মিথ্যা দলিলে সই করিয়ে নিয়ে এই নারীর উপর যে অত্যাচার হয়েছে এবং যে অত্যাচারের মুখে অসহায়ভাবে তার পিতা ও তার স্বামী তাকে সমর্পণ করেছে তাতে তার এই পুত্রটি এইভাবে নিজের জীবনপণে ফাঁসিকেই স্থির পরিণাম জেনেই অত্যাচারীকে হত্যা করেছে; সে দুর্দান্ত, প্রাণবন্ত—তার পক্ষে বোধ হয় এই ছিল স্বাভাবিক। দেশের আইন এতে সম্মতি না দিলেও এই প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিতে উদ্যত হত্যাকারী পুত্রটিকে মানুষ শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়েই মনোলোকে অভিষিক্ত করবে।

আমি মহামান্য হাইকোর্টের কাছে এই বালকের সকল অপরাধের মার্জনার জন্য সুপারিশ করছি।"

দায়রা বিচারের রায়খানা পড়ছিলেন সুধাংশুবাবু। সুধাংশুবাবুর সেই বসবার ঘরে। সেই রাত্রিবেলা। সামনে দাঁড়িয়েছিল সেই চাঁপা—সেই রত্নমালা।

প্রেতিনী নয়, মমতায় বেদনায় জল-টলমল দুই চোখ নিয়ে সুধাংশুবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—মা। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

সকল গ্লানি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত মা।

সুধাংশুবাবু প্রসন্ন এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকালেন।